আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

প্রদত্ত।

সপ্তম খণ্ড।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সার্কিউলার রোড, বিধান যন্ত্রে;

শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

১৭৯৮, ১৭৯৯, ১৮০০ ও ১৮০১ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় আচার্য্য দেবের যে সকল উপদেশ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েকটী উপদেশ বর্ত্তমান সংখ্যায় সঙ্কলিত হইল। কুচবিহার বিবাহের অব্যবহিত পরে যে কয়েকটী উপদেশ ব্রহ্ম-মন্দিরের বেদী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা বিশেষ আদরনীয়। আশা করা যায়, পাঠকবর্গ মনোযোগের সহিত এই সকল উপদেশ পাঠ করিয়া সমুচিত উপকার লাভ করিবেন।

সূচীপত্র।

আচার্য্যের উপদেশ

প্রকৃতি আমাদের গুরু।

১১ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৯।

[সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে।]

সকল গুরুর মধ্যে প্রকৃতি গুরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। প্রকৃতি বাক্যহীন হইয়াও আমাদিগকে নিয়ত উপদেশ দিতেছেন। তিনি আমাদিগকে সৎপথ দেখান, সদুপদেশ প্রদান করেন। যখন আমরা মন্দ পথে নিকৃষ্ট পথে যাই, তখন তিনি আমাদিগকে সৎপথে আনেন, আমাদিগকে সুমতি দিয়া নিকৃষ্ট পথ হইতে নিবৃত্ত করেন। প্রকৃতি কথা কহেন না, তাঁহার মুখ নাই, রসনা নাই, অথচ সর্ব্বদা জ্ঞানোপদেশ দিতেছেন। প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত কে অবিশ্রান্ত উপদেশ দেন? প্রকৃতি। প্রকৃতির ঈশ্বর জীবের উদ্ধারের জন্য প্রকৃতিকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রকৃতি আমাদিগকে কত বিষয়ে উপদেশ দিলেন, আর কেহ কথা কহিল না। সকল গুরুর উপদেশ তাঁহার উপদেশের নিকট নিষ্ফল হইয়া গেল। ভক্তি দেয়, উৎসাহ দেয় সদুপদেশ

দেয়, এমন আর কেহ রহিল না। প্রকৃতি কত নিগূঢ় কথা বলিয়া মনুষ্যের ভ্রান্ত চিত্তকে সত্যের পথে আনিলেন, তাহার কলুষিত চিত্তকে বিশুদ্ধ করিলেন। আকাশের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, আকাশে সূর্য্যও আছে, চন্দ্রও আছে। পৃথিবীর হিতের জন্য উহার পক্ষে দুইই প্রয়োজনীয়। সূর্য্য দ্বারা এক প্রকার চন্দ্র দ্বারা অন্য প্রকার সংসারের উপকার সংসাধিত হয়। যে ঈশ্বর সূর্য্যের রচয়িতা, সেই ঈশ্বর চন্দ্রের রচয়িতা। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য্যকে আকাশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই দুই বস্তু পৃথিবীতে তেজ ও জ্যোৎস্না বিস্তার দ্বারা পৃথিবীকে সুখী করিতেছে, কৃতার্থ করিতেছে। এ দুই না থাকিলে পৃথিবী কখন থাকিতে পারিত না।

আকাশে যেমন সূর্য্য চন্দ্র দুইই আছে, মনুষ্যের চিত্তাকাশে তেমনি সূর্য্য চন্দ্র দুয়েরই প্রয়োজন। ঊর্দ্ধে প্রকৃতিতে চন্দ্র সূর্য্য, নিম্নে মনুষ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির ইঙ্গিতের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিলে, দুই বস্তু হইতে রাশি রাশি জ্ঞান লাভ করা যায়। সূর্য্যের প্রতি তাকাইলে ধর্ম্মের তেজ উৎসাহ বল প্রভাব, চন্দ্রের প্রতি তাকাইলে প্রেম কোমলতা দয়া ক্ষমা শিক্ষা করা যায়। মনুষ্যের হৃদয়াকাশে সূর্য্য না থাকিলেও চলে না, চন্দ্র না থাকিলেও মনুষ্যের সমূহ অনিষ্ট হয়। দুয়ের মধ্যে একটী তেজোময়, একটী সুস্নিগ্ধ। যদি আকাশের

দিকে তাকান যায়, দেখিতে পাওয়া যায় উত্তাপের নিতান্ত প্রয়োজন। উত্তাপ বিনা জীবন রক্ষা পায় না। জীবন রক্ষার জন্য যেমন উত্তাপ, তেমনি তেজ বিনা কাহার চরিত্র পবিত্র থাকিতে পারে না, আত্মার জীবন রক্ষা পায় না। সূর্য্যের আলোকে দিবস যখন উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, সকলেই জাগ্রৎ হয়, আর কেহ নিদ্রিত থাকে না, যাহার যে কার্য্য তাহাতে সে নিযুক্ত হয়। পরিশ্রম অধ্যবসায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা এই সকলের জন্য সূর্য্য গুরুর নিতান্ত প্রয়োজন। সূর্য্য গুরু হৃদয়াকাশে প্রখর তেজ বিস্তার না করিলে আমাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র কর্ত্তব্য যৎপরোনাস্তি যত্নের সহিত পালন করিতে পারি না, জীবনের লক্ষ্য সাধন করিতে অক্ষম হই। তাই সূর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন, সূর্য্য না হইলে জড়তা যায় না কত উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য গ্রহণ করিলাম, এক দিন দুই দিন এক মাস এক বৎসর পরে উহাকে জড়তার হস্তে সমর্পণ করিলাম। পৃথিবীর অধোদিকে দেখিলে কেবলই নিরাশা নিরুদ্দম। যাই উৎসাহ কমিল, নিরুদ্দম হইলাম, প্রকৃতির অঙ্গুলি সূর্য্যকে দেখাইল। ঐ দেখ সূর্য্য কেমন তেজোময় হইয়া গম্ভীর ভাবে উপরের আকাশ হইতে উত্তাপ দিতেছে। হৃদয় তোমাদের উত্তেজিত হউক, আর নিদ্রার সময় নাই। যিনি সূর্য্যের পূজা করেন তিনি নিত্য নূতন উৎসাহ নূতন আনন্দ লাভ করেন, সমুদয় কার্য্য উৎসাহের সহিত করিয়া

যান। সূর্য্য সর্ব্বদা আপন তেজ আপন কিরণ বিস্তার করিয়া সমুদয় অন্ধকার বিনাশ করে। জড়তা অজ্ঞানন্ধকার সূর্য্য কিরণে বিদূরিত হয়, যথার্থ পথ আবিষ্কৃত হয় মন্দ পথ পরিত্যক্ত হয়। সূর্য্যের উপাসনা করিলে, সূর্য্যের নিকট দীক্ষিত হইলে সূর্য্য গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে, জড়তা থাকে না, মনুষ্য আলস্যশূন্য পরিশ্রমী সিংহের ন্যায় বলবান হয়; তেজস্বী বীরপুরুষ হইয়া সমুদয় বিঘ্ন বাধা দুঃখ অন্ধকার জড়তা আলস্য জয় করে। যাহারা সূর্য্য মন্ত্রে দীক্ষিত তাহারা কখন অলস ও ভীরু হইতে পারে না। পাপ কখন তাহাকে মন্দ পথে লইয়া যাইতে সাহস করে না। মনুষ্য সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় হইয়া সূর্য্যের সন্তানের ন্যায় পৃথিবীতে এক একটী সূর্য্য হয়। ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা ব্রহ্মের সাধক, তাঁহারা এক একটী ছোট সূর্য্যের ন্যায় ধর্ম্মতেজে তেজস্বান। এই এক এক সূর্য্য ভক্তি সত্য পুণ্য পবিত্রতার কিরণ দেশ বিদেশে বিস্তার করে। এই কিরণ এক দেশ হইতে অন্য দেশে বিস্তারিত হইয়া বংশপরম্পরা চলিতে থাকে।

সূর্য্য গুরুর যেমন প্রয়োজন তেমনি চন্দ্র গুরুরও প্রয়োজন। কেবল সূর্য্য গুরু হইলে উৎসাহ উদ্যম পুণ্য পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হইবে; কিন্তু কেবল পুণ্যে ক্রমে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবে। যাহারা নীতিবাদী নীতিপরায়ণ, তাঁহারা শুদ্ধজীবন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। নীতিবিষয়ে বক্ত

পুস্তক আছে কত উপদেশ আছে; কিন্তু কেবল নীতিতে মনুষ্য-হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। যাহারা নীতিবাদী, তাঁহারা সত্যপথে চলেন, সর্ব্বদা উদ্যমের সহিত কর্ত্তব্য পালন করেন; কিন্তু প্রাণ তাঁহাদিগের কোমল নহে। আকাশে যেমন চন্দ্র আছে, প্রাণের আকাশেও তেমনি চন্দ্র আছে। মনুষ্য তোমার হৃদয়ে চন্দ্র কে? প্রেম। চন্দ্র-সাধনে নিযুক্ত হইলে প্রেম-সাধন হইবে—কোমলতা সাধন হইবে। কেবল সূর্য্যের অনুসরণ করিলে চলিবে না, চন্দ্রের পথেও চলিবে না, হৃদয়ে চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সমুদয় বৃত্তি সুকোমল হইবে। একই সময়ে তেজস্বী হইবে অথচ সুকোমল হইবে। পুণ্য-কিরণে উদ্দীপ্ত এবং প্রেম-কিরণে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিবে। পিতা মাতা ভাই ভগ্নী গৃহ পরিবার প্রতিবাসী সকলের উপরে প্রেম বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ক্রমে প্রেমের পরিধি বর্দ্ধিত হইয়া সেই মধ্য-বিন্দু হইতে দেশ দেশান্তর গ্রাম গ্রামান্তর এক প্রতিবাসী হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাসী, এইরূপ সমুদয় মনুষ্য-সমাজকে অধিকার করিবে।

চক্ষু যত দূর যায়, মনুষ্য সমাজ তত দূর বিস্তৃত। সুতরাং অতি দূর স্থান হইতে দুঃখের সংবাদ আসিলেও তখন হৃদয় উত্তেজিত হয় প্রাণ আকুল হয়। এক পরিবারের প্রতি স্নেহ সমুদয় মনুষ্য সমাজের প্রতি স্নেহ উদ্দীপিত করিয়া দেয়। স্নেহ ছাড়া হৃদয়ের কোমল পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয় না।

চন্দ্রের জ্যোৎস্না না থাকিলে কেবল সূর্য্যের উত্তাপে পুষ্প কখনও হাসে না। যে হৃদয় সূর্য্যের কিরণে তেজোময়, সেই হৃদয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সহাস্য ভাব ধারণ করে। এইরূপে মনুষ্য-হৃদয়ে শক্তি এবং শান্তির মিলন হয়, তেজ এবং জ্যোৎস্না, পুণ্য এবং প্রেমের বিবাহ হয়। ধর্ম্ম জগতে এ দুয়ের মিলনে কল্যাণ হয়। এ দুয়ের মধ্যে শুভ উদ্বাহ না হইলে, প্রকৃত কল্যাণের অভ্যুদয় হয় না। সূর্য্যের অনুসরণ করিলে যেমন সত্য-ধর্ম্ম বীরত্ব শুদ্ধতা প্রাপ্তি হয়, চন্দ্রের অনুসরণ করিলে তেমনি প্রেম কোমলতা লাভ হয়। এক স্থানে দুয়ের মিলন হইলে সমুদয় বংশ সমুদয় পরিবারে তাহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক যেমন এক দিকে বীরের ন্যায় সমুদয় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সত্য ও পবিত্রতার রাজ্য বিস্তার করেন, তেমনি নিজ জীবনের সুমধুর ভাব দ্বারা পৃথিবীকে জয় করেন। কোন সাধকের চন্দ্রকে ভুলিয়া সূর্য্য বা সূর্য্যকে ভুলিয়া চন্দ্রের অনুসরণ করা উচিত নয়। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে এ দুয়েরই থাকা প্রয়োজনীয়। মানিলাম দুই একত্র করা কঠিন, কিন্তু প্রকৃতির তাৎপর্য্য বুঝিলে স্বীকার করিতে হয়, চন্দ্রের সুকোমলতা এবং সূর্য্যের তেজস্বিতা দুই সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পারে। বিজ্ঞানবিদ্গণ জানেন চন্দ্রের সুকোমল জ্যোৎস্না আপনার জ্যোতিতে নহে, সূর্য্যের জ্যোতিতে তাহার জ্যোতিঃ। চন্দ্রে কোমলতার মধ্যে সূর্য্যের

সমুদয় ভাব আছে। প্রেম ও পুণ্য এ দুয়ের মধ্যে কোন অমিল নাই। তাই বলি যেমন এক চক্ষু তোমরা সূর্য্যের উপরে রাখিবে, তেমনি অপর চক্ষু চন্দ্রের উপর রাখিবে। যেমন সত্য গ্রহণ করিবে, তেমনি হৃদয়ে প্রেমের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। এক হস্ত সত্য শুদ্ধতা এবং ধর্ম্মের উপরে রাখিবে, অপর হস্তে প্রেমকুসুম সঞ্চয় করিবে। যদি এইরূপে সত্য ধর্ম্ম, শুদ্ধতা এবং প্রেম সঞ্চয় কর, সুখী হইবে। শুদ্ধতা-বিহীন অপবিত্র বিকৃত প্রেম এবং প্রেমবিহীন শুষ্ক কঠোর পুণ্য এ দুইই পরিত্যাগ করিবে। সূর্য্য এবং চন্দ্র উভয়কে গুরু কর, সত্যনিষ্ঠ সাধু এবং সুকোমল প্রেমিক হইয়া কৃতার্থ হইবে।

ঘর ও দ্বার।

২৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

এক দিন দেবালয়ে ঘর ও দ্বারের সঙ্গে আলাপ হইতেছিল। আলাপের বিষয় কি? তুমি বড় কি আমি বড়? তুমি বড় কি আমি বড়, ঘর ও দ্বারের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থিত হইল। অনেক কথোপকথনের পর মীমাংসা হইল দেব-মন্দিরের ঘরও বড় দ্বারও বড়; কিন্তু ঘর অপেক্ষায় দ্বার বড়। পৃথিবীতে ধর্ম্ম-জগৎ মন্দিরের প্রশংসা করে, মন্দিরের

মহিমা স্বীকার করে, মন্দিরকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু মন্দিরের দ্বারকে কেহ তো প্রশংসা করে না, শ্রদ্ধা করে না, ইহার মহিমা কেহ দেখিতে পায় না। মন্দিরের দ্বার ছোট, মন্দির মহৎ। যেখানে ভক্তমণ্ডলীকে ঈশ্বর কৃতার্থ করেন, সেখানে হরি নাম উচ্চারিত হয়, যেখানে কত বিমলানন্দ লাভ হয়, কে তাহার গুণ মুখে বর্ণন করিবে? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন কে আছে যে ব্রহ্মমন্দিরের জয়পতাকা হস্তে ধারণ করিবে না? যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঘর বড় কি দ্বার বড়, সমুদয় ব্রাহ্মজগৎ মহা উৎসাহের সহিত বলিবে, ব্রহ্মমন্দির বড় ও উপাসনা ঘর বড়, দ্বার নহে। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই আরাধনা গৃহ, কুটীর, ঠাকুর ঘরকে শ্রেষ্ঠ বলে। কাহারও নিকট শুনা গেল না ঘর অপেক্ষা দ্বার মহৎ। যে দ্বারের এক দিকে পৃথিবী এক দিকে দেব গৃহ, সেই দ্বারটী যে একটী বিশেষ স্থান, তাহার যে বিশেষ মহিমা আছে, অনেকের চিন্তাপথে ইহা উদিত হয় নাই।

ব্রহ্মমন্দিরে দ্বারের মহিমা কে কোথায় কীর্ত্তন করিয়াছে? ঘরের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের প্রশংসা কোথায় কোন্ পুস্তকে লেখা আছে? পৃথিবীর মধ্যে এমন একটী জঘন্য স্থান আছে যে স্থানের সম্বন্ধে লোকে বলিয়া থাকে, ঘরের বাহিরে পুণ্যের মাটী আছে। সেই স্থানে পুণ্য ত্যাগ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন জন্য প্রবেশ করিতে হয়। সেই এক কথা লোকে জানে সত্য, কিন্তু মন্দিরের কোন্ অংশটীর

মহিমা অধিক, এ বিষয়ে কেহ কোথাও কি কিছু শুনিয়াছে? দ্বারের বাহির, ঘরের মধ্য, কি ঘরের মধ্যস্থ কাষ্ঠাসন, কোন স্থান মহিমান্বিত? মধ্য কি অন্ত কি বাহির কোন্ স্থান বিশেষ? ঘরের ভিতরের মহিমা তো আছেই, দর্শক-গণের হৃদয় সে স্থান দ্বারাই তো আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ মহিমা এই ঘরের দ্বারের। এই ঘরে প্রবেশ করা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য। উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ, উপাসনাস্থানস্পর্শ ইহার মধ্যে দ্বারসংস্পর্শ প্রধান। শাস্ত্রী বলিবেন, প্রবেশ ও উপবেশন এ দুয়ের মধ্যে প্রবেশ উচ্চতর। দ্বারস্পর্শ কত মহৎ কার্য্য। ইহার উপরে দেবমন্দিরের মহিমা নির্ভর করে। ভাল ভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে, মন্দিরে ভাল ভাবে উপবেশন এবং ভাল ভাবে উপাসনা হইয়া থাকে। যদি ভাল মনে প্রবেশ করা না হইল, তবে উপাসনা ভাল হইবে কি প্রকারে?

বাহির হইতে দৌড়িয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিও না। ঘরের বাহিরে কিয়ৎকাল দাঁড়াও। ঘরের দ্বারে স্বর্ণাক্ষরে কি লিখিত আছে একবার দেখ। "এখানে প্রস্তুত হইয়া প্রবেশ কর" দ্বারে লিখিত আছে। প্রবেশ করিতে যাইতেই দ্বারবান্ জিজ্ঞাসা করিবে "কেন আসিতেছ? কিছু পাইবার আশা করিয়া কি আসিয়াছ? এই মাত্র সংসার ছাড়িয়া আসিলে, চিন্তাবিহীন হইয়া প্রবেশ করিও না।" অনেকে অসার তর্ক করিয়া এই কথার প্রতি কর্ণপাত করে না,

দ্বারবানের কথা কেহ ভুলিয়াও ভাবে না। মন্দিরের দ্বারে, উপাসনাগৃহের দ্বারে, ঠাকুর ঘরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কোথায় ছিলে, কোথা হইতে এখানে আসিলে, কি ভাবে ছিলে, কিরূপ ভাবে প্রবেশ করিতে হইবে ভাব। দ্বারবানের প্রতি আজ্ঞা কাহাকেও প্রস্তুত না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। এখানে দাঁড়াও, নিমেষের মধ্যে পরিবর্ত্তন হইবে। সংসারের বৃথা চিন্তা ছাড়; ভক্তি আশা বিশ্বাস প্রেম হৃদয়কে সজ্জিত কর; এখন ভিতরে যাও। কারণ ঈশ্বরের প্রসাদ লাভে এই সকল মূলীভূত।

যদি দ্বারে এইরূপে প্রস্তুত হও, অবশিষ্ট যাহা কিছু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সহজে সিদ্ধ হইবে। সংসারের এক ঘর ছাড়িয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করার ন্যায় এখানে চিন্তা না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কখন প্রবেশ করিও না। যদি শীঘ্র প্রবেশ করিয়া থাক যখন ফিরিয়া আসিবে, দেখিবে কিছু হইল না। দ্বারের বাহিরে চিন্তা করিলে এক মিনিটে সকল সিদ্ধ হইবে। যদি এক মিনিটে না হয় দশ মিনিট থাকিতে হইবে। যথার্থ ভাব না হইলে সাধকের এখানে প্রবেশ নিষেধ। এ স্থান কি দুই ঘণ্টা কাল আমোদ করিয়া কাটাইবার স্থান? যদি আমোদের স্থান না হয়, এখানে মন প্রস্তুত করিয়া আসিতে হইবে। মন্দিরের দ্বারে ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ কর, মন্দিরে প্রবেশ যেন বিফল না হয়, তাঁহাকে বল। দেখিবে উপাসনার পথ প্রমুক্ত হইবে। গৃহ

মধ্যে প্রবেশ করিয়া "আমাকে পবিত্র কর," "আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর," শত বার বল। যদি যথার্থ ভাবে গৃহ প্রবেশ না হইয়া থাকে কিছু হইবে না। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হও, দেখিবে ইহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য হইবে। এখানে একটী প্রার্থনায় প্রস্তুত করিয়া দিবে। ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবেন, এই কয়েকটী সন্তান অন্যমনস্ক হইয়া আসিয়াছে, আশা নাই, বিশ্বাস নাই, মন স্থির নাই, তাহাদের কথা শুনিবেন না; আর এই পাঁচটী, মন প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে, সরল ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মস্তকে তিনি স্বর্গের পুষ্প বর্ষণ করিবেন। অতএব বলিতেছি যদি আশীর্ব্বাদ চাও, ধন্য হইতে চাও, দ্বারে প্রস্তুত হইয়া আইস। দ্বারে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে কিছুই হইবে না। এই জন্য বলি দ্বারের অতি মহামান্বিত পদ।

দ্বার সম্বন্ধে আরো এক কথা আছে। যখন গৃহে প্রবেশ করিলে দ্বারবান্ দ্বার ছাড়িয়া দিল এবং বলিয়া দিল মন্দির হইতে বাড়ীতে কি লইয়া যাইতেছ এখানে দেখাইয়া যাইও। প্রাণের আধার খুলিয়া যদি দেখ কিছু নাই, বাহিরে যাইতে নিষেধ। প্রভুর নিকট হইতে কিছু না লইয়া ঘরের বাহির যাইতে পারিবে না আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলে, বলিলে "উপাসনা করিলাম, ধ্যান করিলাম, আরাধনা করিলাম, কিছুই হইল না। প্রভো! শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতেছি।" দ্বারবান্ যে দ্বার ছাড়িবে না। যেমনি এই বলিয়া কান্দিলে, তোমার

ধ্যানে হৃদয়ে মহাপ্রভু পুণ্য শান্তি আনন্দ বর্ষণ করিলেন। গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় প্রহরীকে কি অনুগ্রহ পাইলে দেখাইয়া গৃহে চলিলে। দেখ দ্বারে এক মিনিট দুই মিনিট প্রতীক্ষা করিয়া কি হইল? দ্বার কিছু সহজ বস্তু নয়। তুমি যদি দ্বার হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাক, চলিয়া যাইবার সময় দেখিবে তোমাতে অন্যেতে কি প্রভেদ। তুমি দেখিতে পাইবে তোমার উপাসনা পূজা সকলই সফল হইয়াছে। দ্বার হইতে প্রস্তুত হইয়া যাইবার যে কি ফল কেহ চিন্তাও করে নাই। কজন সে বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা না করিয়া থাকে। মন্দির হইতে দ্বার বড়। যে দ্বার ছাড়িয়া সহজে যায়, সে ব্রাহ্ম নহে। দ্বারে আসিবা-মাত্র যাহার মনে চিন্তা উদিত হয় না, বিশেষ ভাবের উদ্রেক হয় না, চিত্তে গাম্ভীর্য্য আইসে না, সে মানুষ নহে। তাহার হৃদয়ে উপাসনার কোন ফল ফলে না। উপাসনার মধ্যে এক এক বার দ্বারের দিকে তাকাইবে। দ্বারবানকে কি উত্তর দিয়া যাইব, কি ফল পাইলাম জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিয়া ঘর ছাড়িয়া যাইব, কি রত্ন দেখাইয়া বাহির হইব, মধ্যে মধ্যে এই প্রশ্ন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। যদি এরূপ না কর, দ্বারে গিয়া বিপদে পড়িবে। বুঝি আজ বিপদে পড়িলাম, উপাসনা মধ্যে এরূপ ভয় হওয়া প্রয়োজন। আজ যেন দ্বারে অপরাধী হইয়া না যাইতে হয়, দ্বারবানকে বুঝাইয়া যেন বাড়ী যাইতে পারি, এরূপ ভাব হইলে,

ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে। যাহারা দ্বারের প্রতি ভক্তি দেখায়, শ্রদ্ধা দেখায়, সম্মান দেখায়, উচ্চভাবে আদর করে, ঈশ্বর দয়া করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান।

অতএব এই মন্দিরের প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ তাঁহারা এই কথা যেন মনে রাখেন। লঘু মনে লঘু হৃদয়ে ব্রহ্মের গৃহে যেন প্রবেশ করা না হয়। আসিবার সময় যাইবার সময় যেন গম্ভীর ভাব রক্ষা করা হয়। মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া যেন বৃথা সংসারের গল্প করা না হয়। মন্দিরের মধ্যে বসিয়া বরং অন্য চিন্তা মনে আসিতে দিতে পার, কেন না আমি দেখিতেছি, অনেকেরই এরূপ হয়; কিন্তু যখন দ্বারের বাহিরে থাক সে সময়ে গম্ভীরভাব বিদায় করিয়া দিও না। বৃথা গল্প করিতে করিতে যেন মন্দিরে প্রবেশ করা না হয়। সংসারের এক গৃহ হইতে অপর গৃহে প্রবেশ করিতেছি, এখানকার প্রবেশ যেন সেরূপ না হয়। এখানকার প্রবেশ অতি পবিত্র ব্যাপার। এ দ্বার কি সামান্য দ্বার? মন্দির অপেক্ষা দ্বার কি কখন নিকৃষ্ট? যদি নিকৃষ্ট বলিয়া জান, তবে মন্দির কি চেন নাই। যে ব্যক্তি মন্দিরের মহত্ত্ব বুঝিতে গিয়া দ্বারের অবমাননা করে সে কখন মন্দিরকে সম্মান দিতে পারে না। মন্দির গুরু, দ্বার তদপেক্ষা গুরুতর। মন্দির উচ্চ, দ্বার তদপেক্ষাও উচ্চতর। মন্দির অতি মহৎ, দ্বার তদপেক্ষাও মহত্তর। মন্দির দেখিলে মন গম্ভীর হয়, দ্বার দেখিলে ভয় হয়। এখানে প্রবেশ করে কাহার

সাধ্য। ঠিকভাবে ইহার দিকে চাহিলে, সকলে ইহার নিকটে আসিতে পারে না। অতএব দ্বারে আসিয়া স্থির হও। দ্বারকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমি প্রবেশ করিতে পারি কিনা? দ্বার যদিও জড়, তাহার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিবে তোমার পক্ষে এখনও ঘণ্টা বাজে নাই। কেন মন্দিরে যাইতে নিষেধ হইল যেমনি ভাবিবে, অমনি দুষ্কর্ম্ম, অবিশ্বাস, নিরাশা, কুবাসনা জড়তা দেখিতে পাইবে। তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে অমনি দ্বার খুলিয়া যাইবে। যাহা এতদিন কিছুতেই যায় নাই দেখ তাহা একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে বিদূরিত হইল। তাই বলিতেছি মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে এই ভাবে প্রবেশ কর। অদ্য যে সঙ্কেত বলিলাম, এক সপ্তাহকাল মন্দির উপাসনা গৃহ সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়া দেখ, দেখিবে উপাসনা গম্ভীর হয় কিনা, হৃদয় সরল হয় কি না? যদি মন্দিরে উপাসনা গৃহে এইরূপে প্রবেশ কর, দেখিবে প্রার্থনা স্তব স্তুতি আরাধনা ধ্যান কেমন সতেজ হয়। উপাসনা ভাল হওয়া উপাসনা গৃহে প্রবেশ করার উপরে নির্ভর করে। জানিও প্রবেশের অবস্থা অনুসারে ফললাভ করিবে। তাই বলিতেছি সকলে আকুল হইয়া বিশ্বাস আশা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ কর। যাইবার সময় একটি একটি রত্ন পাইয়াছ দেখিতে পাইবে।

প্রকৃত বৈরাগ্য।

রবিবার, ৬ই ফাল্গুণ, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

এক দিকে সংসার আর একদিকে ঈশ্বর, মধ্যে বৈরাগ্য। কতগুলি লোকের গতি ধর্ম্ম হইতে সংসারের দিকে, কতগুলি লোকের গতি সংসার হইতে ধর্ম্মের দিকে। অধিকাংশ লোক ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া কেবল সংসার করে। অল্প লোক সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে চলিয়া যায়। যাহারা সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য পথ দিয়া অরণ্যে চলিয়া যায় পৃথিবী তাহাদিগকে বৈরাগী বলে। কিন্তু সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য অরণ্যে পলায়ন করা বিকৃত বৈরাগ্য। যথার্থ বৈরাগ্য সেই বন্ধন যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে সংসারে বদ্ধ করা যায়, অথবা যাহা দ্বারা সংসার এবং ধর্ম্ম এক হয়। সেই অগ্নি কি যাহাতে সংসার এবং ধর্ম্ম এই দুইকে নিক্ষেপ করিলে দেখিবে দুই এক হইয়া যাইবে, অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম হইয়া যাইবে? সেই অগ্নি বৈরাগ্য অগ্নি। এই জন্য সংসারের মধ্যে বাস করিয়াও যথার্থ বৈরাগীর ভয় নাই। তাঁহার বিশ্বাস এত প্রবল তিনি দেখেন ঈশ্বরই তাঁহার সংসার। তিনি স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে চলিয়া গেলে এই পরিচয় দেওয়া হয় যেন সংসারে ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম নাই। যাঁহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা,

ভাই, ভগ্নি ইত্যাদি সমুদয় স্থান হইতে বিশ্বেশ্বরকে ধাক্কা দিয়া দূর করিতে করিতে অরণ্যে কেবল একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তের মধ্যে নিয়া বদ্ধ করেন তাঁহারা বিকৃত বৈরাগী। যদি পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে ঈশ্বরকে না দেখা যায় তবে বৈরাগ্য ভাব কোথায়? ঈশ্বর এখানে নাই, ঈশ্বর ওখানে নাই, যিনি এই কথা বলেন তিনি কি বৈরাগী? এত বড় ঈশ্বরকে যিনি ভস্ম মধ্যে অথবা ক্ষুদ্র স্থানে বদ্ধ করেন তাঁহার বৈরাগ্যকে কিরূপে প্রকৃত বৈরাগ্য বলিব। প্রকৃত বৈরাগী বলেন "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" "এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎ-সমুদয়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।" তিনি আহা-রের সময় বলেন "এই যে ক্ষুদ্র একটী অন্ন, ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর বাস করিতেছেন।" ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের লীলা প্রকাশ করে। প্রকৃত বৈরাগী এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর পাঠ করেন। বৈরাগ্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! অন্যেরা যেখানে নরক দর্শন করে বৈরাগ্য সেখানে স্বর্গ দর্শন করেন। বৈরাগ্য অধর্ম্মের মধ্যে দেবমন্দির স্থাপন করেন। বৈরাগ্যের কি প্রতাপ!! বৈরাগ্য ভয়ানক জঙ্গল কাটিয়া তাহার স্থানে সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। হৃদয়ের মধ্যে যত সুন্দর বন আছে, বৈরাগ্যই কেবল সে সমুদয় পরিষ্কার করিতে পারেন। ঈশ্বর কেবল বৃন্দাবনে থাকেন কলি যুগের এই

কথা। সত্য যুগের বৈরাগী বলেন সমস্ত জগৎ বৃন্দাবন। প্রকৃত বৈরাগী বলেন সেখানে সাধারণ মনুষ্য অধর্ম্ম দেখে আমি যেখানে বৈরাগ্য স্থাপন করিব। যে অর্থ অধর্ম্ম এবং অনর্থের সহায় সেই অর্থের মধ্যে আমি ধর্ম্ম স্থাপন করিব। সত্য যুগের বৈরাগী বলেন, টাকার আগুণ জ্বালিয়া দাও, আমাকে তন্মধ্যে বসাও, যত প্রলোভন আছে আমার নিকট আসিতে বল, ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ইহাদের প্রত্যেক ব্যাপার মধ্যে আমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। চারিদিকে বিপদ প্রলোভন, শিশু জননীর উপর নির্ভর প্রকাশ করিতে লাগিল। যত ভয় তত ভয়-ভঞ্জন ঈশ্বরের প্রতি বৈরাগীর মন স্থির হইতে লাগিল। মনুষ্য যে স্ত্রীকে পূর্ব্বে অধর্ম্মের কারণ বলিত, বৈরাগ্য সঞ্চারের পর সেই স্ত্রীর মুখে পতির প্রতি ভক্তি দেখিয়া পতির পতি বিশ্বপতিকে কিরূপে ভক্তি করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিল। এইরূপে বৈরাগীর আর কোন কার্য্য নাই, তাঁহার হস্তে সূঁচ আর সূত্র, তিনি যে কোন ঘটনা বা বস্তু ধরেন তাহাই ঈশ্বর এবং পরলোকের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। কি চন্দ্র, কি পক্ষীর শব্দ, কি নদীর কল্লোল প্রকৃতির সমুদয় ঘটনা বৈরাগীর মনে ধর্ম্ম ভাবের উদ্বোধন করে। সত্যযুগের বৈরাগী সংসারকে স্বর্গে পরিণত করেন। প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিরা যদি আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহারা হয় তো সভ্যতাভিমানী রাজপুরুষদিগকে অভিশাপ দিয়া বিদায় করিয়া আপনারা গিরিগহ্বরে বাস

করিবেন। যথার্থ বৈরাগ্য পৃথিবীর উচ্চতম স্থানের সঙ্গে সম্মিলিত। কল্পিত বৈরাগ্য বলে গাড়ী ঘোড়াতে ঈশ্বর নাই; কিন্তু প্রকৃত স্বর্গীয় বৈরাগ্য বলেন জগন্নাথ ক্ষেত্র সমুদয় পৃথিবী। একজন সামান্য লোক সামান্য কথা বলিয়া যাইতেছে প্রকৃত বৈরাগী বলেন, উহা মানুষের কথা নহে, উহা আমার ঈশ্বরের কথা। নৌকা ডুবিল, ঈশ্বরের ঘটনা, নৌকা আরোহী-দিগকে লইয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইল ঈশ্বরের ঘটনা; মনুষ্য মরিল ঈশ্বরের ঘটনা, নবকুমার জন্মিল ঈশ্বরের ঘটনা; চন্দ্র উঠিল না, ঈশ্বরের ঘটনা, আকাশে চন্দ্র উঠিল ঈশ্বরের ঘটনা। দরিদ্রতা, দুঃখ ভস্ম আসিয়া জুটিল, প্রকৃত বৈরাগী বলিলেন, প্রভু, এ সকলই তোমার প্রেরিত। সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, সুখ শান্তি আসিল, সেই প্রকৃত বৈরাগী বলিলেন, প্রভু, এখানেও তুমি, এ সকল তোমারই দান। অন্য লোকে বলে বৃন্দাবন বা জগন্নাথ ক্ষেত্র ছাড়িয়া আবার সংসারে আসিলাম, প্রকৃত বৈরাগী বলেন, "সমস্ত জগৎ বৃন্দাবন, সুতরাং বৃন্দাবন ছাড়িয়া আর যাইব কোথায়।" একটুকু সামান্য শষপ কণার মধ্যেও সেই জগন্নাথের মন্দির। নাস্তিকেরা বলে, মনুষ্যই ঘটনা সকল সংঘটন করে। বিবেকী বৈরাগী হাসিয়া বলেন, "ঘটনা গুলি গোলার মত। ঈশ্বর সে সকল লইয়া লীলা খেলা করেন। এ সকল ঘটনা মধ্যে চাদিদিকে সহস্র সহস্র বেদ পাঠ কর।" বৈরাগীর দক্ষিণ হস্ত সংসারকে স্পর্শ করিল আর বৈকুণ্ঠধাম সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইল।

সংসার গঠনের কৌশল।

১লা মাঘ, রবিবার, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

আশ্চর্য্য সংসারের গঠন! কি নিগূঢ় কৌশল ধর্ম্মরাজ্যে বিরাজ করিতেছে। ইহা ভাবিলে ভাবুক ব্যক্তির অত্যন্ত আমোদ হয়, চিন্তাতে অত্যন্ত সুখোদয় হয়। যখন ভাবা যায় যাহাদের দ্বারা অদ্য পরিবেষ্টিত আছি ইহারা কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল, কেনই বা ইহাদিগকে ভাই বলি বন্ধু বলি, তখন কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। স্বর্গে যাওয়াই যদি জীবনের শেষ গতি হইত, তাহা হইলে কেবল একটী সোপান প্রস্তুত করিলেই হইত। সেই সোপান দিয়া স্বর্গে টানিয়া লওয়ার নিয়ম কেন ঈশ্বর করিলেন না? একটী সোপানে আরোহণ করিলে প্রত্যেক জীবন উর্দ্ধে উঠিয়া যাইত, এরূপ একটী সাধন প্রণালীই বা কেন নির্ম্মিত হইল না? মনুষ্য জীবন উদ্ধারের উপায় তো অনায়াসেই করিতে পারিতেন? তবে এই এক বিষয় লইয়া এত আড়ম্বর করিলেন কেন? প্রকাণ্ড একটী জনসমাজ, তাহার মধ্যে আবার দেশ বিদেশ, জাতি বিজাতি, গৃহ পরিবার, তন্মধ্যে আবার বিবিধ প্রকারের সম্বন্ধ, এতগুলি সম্বন্ধজালে প্রত্যেক মনুষ্যকে ঈশ্বর বদ্ধ করিলেন কেন? তিনি ভব-সাগরের কাণ্ডারী, মনুষ্যকে ভবসাগর পার করিবার জন্য

একখানি নৌকা প্রস্তুত করিলেন না কেন? মনুষ্যকে একাকী যোগের ক্ষেত্রে বসাইলেন না কেন? সাধন আবার সজন হইল কেন?

দশ জনের সঙ্গে গোলমাল করিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বর ধর্ম্মরাজ্যের গঠনে এরূপ আড়ম্বর করিলেন কেন প্রশ্ন হইতেছে। এ প্রশ্নের সদুত্তর এই, পুণ্য এবং পাপ যাহাতে একগুণ বা দ্বিগুণ হয়, এই মর্ম্মে সমুদয় ধর্ম্মরাজ্য গঠিত হইয়াছে। যদি মনুষ্য নির্জ্জনে একাকী থাকে, ধর্ম্ম এক গুণ থাকে, পাপও এক গুণ থাকে। সেই এক গুণ পুণ্য এবং এক গুণ পাপকে দ্বিগুণ করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বর মনুষকে সমাজ বদ্ধ করিয়াছেন। অন্যান্য যত অভিপ্রায় আছে তন্মধ্যে এই অভিপ্রায়ের গূঢ় তাৎপর্য্যটী সর্ব্বদা চক্ষুর নিকটে রাখা উচিত। যদি নির্জ্জনে এক গুণ ধার্ম্মিক হও, সামাজিক হইলে অমনি এক গুণ ধর্ম্ম দ্বিগুণ হইবে; এক গুণ দশ গুণ বা শত গুণ হইবে এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিন্দু মাত্র ধর্ম্ম পর্ব্বত শিখরে ধারণ করিলে ঐ এক বিন্দু ধর্ম্ম মনুষ্য সমাজে আনিলে সিন্ধুর আকার ধারণ করিবে। সুতরাং সামাজিক হওয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট ষোল আনা পুণ্যবল চাহিয়া থাকেন। মনুষ্য যদি নির্জ্জনবাসী হইয়া চলিত, তাহাকে ষোল আনা পুণ্যবল নিজে সাধন করিতে হইত। যদি দ্বিগুণ করিবার অঙ্ক

শাস্ত্র মান, তবে তোমার কেবল আট আনা সাধন করিলেই সমুদয় হইবে। নির্জ্জনে আট আনা সাধন করিলে সজনে উহা ষোল আনা হইবে, এক গুণ পুণ্য দ্বিগুণ হইবে। কেন হইবে? খাও আর দাও। হরি নাম করিলে আনন্দ হয়, মনে সুখ হয়, কিন্তু আপনি হরিনাম করিয়া অন্যের মুখে হরিনাম শুনিয়া দ্বিগুণ আনন্দ হয়। চক্ষু মুদিত করিয়া হরিনাম করিলে কত আনন্দ কত সুখ; কিন্তু চক্ষু খুলিয়া যদি দেখিতে পাই আরো দশ জন ভক্ত হরিনাম শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া আছেন, এক গুণ আনন্দ দশ গুণ হইয়া উঠে। দেখ ইহার জন্য বিশেষ সাধন করা হইল না, অথচ একেবারে প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস কোথা হইতে আসিল! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাচিতেছি "দীননাথ বল মন"। এই এই সুমধুর সময়ে পাঁচটী ভক্ত মিলিত হইয়া তাঁহারাও বলিল "হরি বল মন" "হরি বল মন" বলিতে আরম্ভ করি-করিলেন। আমার এক গুণ নৃত্য দশ গুণ হইল। নৃত্য পরিশেষে উন্মত্ততার আকার ধারণ করিল। দেখ কেমন সহজে এক গুণ আনন্দ দশ গুণ, এক গুণ পুণ্য দশ গুণ পুণ্য হইল।

আমি নিজে দয়াময় বলিতেছি, সেই নাম পাঁচ জনকে শুনাইয়া পাঁচ গুণ পুণ্য হইল, নিজের চিত্ত শুদ্ধি করিতে গিয়া আর দশ জনের চিত্ত শুদ্ধি হইল। আমি আমার বাগানের গাছে জল দিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সেই জল

ভূমির মধ্য দিয়া গিয়া প্রতিবাসী পাঁচ জনের বাগান উর্ব্বরা করিল। আমার বাগানে ফুল ফোটে, তাহার সঙ্গে অন্যের বাগানেরও ফুল ফুটিতে লাগিল। সাধকের উদ্যানে একটী পুণ্যের ফুল ফুটিলে তাহার প্রতিবাসীর উদ্যানে তদ্রূপ ফুল ফুটিবে। সাধক একটী সত্য কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া দশ জনের সত্যে অনুরাগ হইল। আমি সত্যবাদী হইলাম আমার উপকার হইল, কিন্তু তাহাতেই সমুদায় পৃথিবীর সত্যবাদী হইবার উপায় হইল। আমি জিতেন্দ্রীয় হইলাম, কঠোর সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করিলাম, সেই তেজ প্রতিবাসীর গৃহে প্রবেশ করিল। যদি আমাতে আলোক সঞ্চিত হয়, তাহা অর্দ্ধ হস্ত মধ্যে কখনই থাকিতে পারে না। আলোক যদি আলোক তবে উহা বিস্তৃত হইবেই। আলোক এক স্থানে রাখিলে উহা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। পুণ্য আপনাকে আপনি বিস্তার করে দীর্ঘাকার করে, আপনাপনি বাড়ীতে থাকে। কেন বাড়ে। জনসমাজের আছে বলিয়া বাড়ে? যদি নির্জ্জন হইতাম, আমার পুণ্য আমার থাকিত, এক গুণ পুণ্য লইয়া পরলোকে যাইতাম। আমরা জনসমাজস্থ, আমরা, এখানে পরের সেবা করিয়া চারিদিকে আলোক বিস্তার করিব। আমাদিগের পুণ্য সূর্য্যের তেজ ঘরে ঘরে প্রবেশ করিবে। ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক, আমরা এইরূপে অল্প চেষ্টায় প্রচুর ফললাভ করিব। আট আনা

প্রেমপুণ্য উপার্জ্জন করিলে উহা এইরূপে ষোল আনা হইবে। এক গুণ পুণ্য দশ গুণ হইবেই হইবে। সাধক! তুমি পুণ্যবান্ হইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিবাসী ও দেশের পুণ্য বৃদ্ধি কর, আপনার পুণ্য সঞ্চয় কর। এক জন পুণ্যবান্ পুণ্য পথে চলিলে আর দশ জন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে। এক জন পুণ্যবানের সঙ্গে দশ জন অনায়াসে ধর্ম্মের রথ টানিয়া লইয়া যাইবে। সংসার সাগরে কখনও একখানি জাহাজ একাকী যাইতে দেখ নাই। কিন্তু এক জন মহাজনের জাহাজ চলিলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশখানি জাহাজ সম্বদ্ধ হইবে; পুণ্যের পথে এক শত জন সহস্র জন সহযাত্রী থাকিবে। এক জনের পুণ্য বাড়িলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের পুণ্য বাড়িবে।

একবার ছবিখানি উল্টাইয়া ধর। দেখ এখন নিয়ম কি? একদিকে যেমন ধর্ম্ম সাধনের সহজ উপায় দেখা গেল, এদিকে তেমনি এক গুণ পাপ দ্বিগুণ হওয়া সহজ হইল। এক্ষণে পাঁচ জন আছে বলিয়া পাপ দ্বিগুণ হয়। জনসমাজ ছাড়িয়া মনে মনে পাপ করিলে মিথ্যা চিন্তা করিলে, দুষ্কর্ম্ম করিলে, অহঙ্কারী হইলে পাপাচরণ এক গুণ রহিল। কিন্তু জনসমাজের মধ্যে থাকিয়া যদি ঘরে বসিয়া থাক, দেখিবে তোমার ঘর হইতে পাপ জঞ্জাল বাহিরে গিয়া পাড়ার লোকের জঞ্জাল হইয়াছে। তুমি এখানে বিষ ঢাল, উহা প্রবাহিত হইয়া প্রতিবাসীর ঘরে যাইবে। তুমি আপনার আলোক

নিবাইলে দেখিবে তাহাতে প্রতিবাসীর ঘর অন্ধকার হইবে। তুমি অসাধু হইলে দেখিবে তোমার সঙ্গে আর দশ জন অসাধু হইবে। তুমি মিথ্যা বলিয়া বায়ু দুর্গন্ধ করিলে সেই দুর্গন্ধে চারিদিকের বায়ু দুর্গন্ধ করিল এবং যাহাদিগের নাসিকা স্পর্শ করিল তাহারা সকলে কলঙ্কিত ও দুষিত হইয়া গেল। তুমি কঠোর কথা বলিলে পাঁচ জনের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, তন্মধ্যে দুটীর হৃদয় হইতে রক্ত বাহির হইয়া অত্যন্ত ক্ষীণ বল হইয়া মরিয়া গেল। তুমি মনে মনে বুঝিলে আমি কেবল দুএকবার পাপ করিয়াছি, কিন্তু তোমার সেই পাপের অংশী কত জন হইল। তোমার পরিবার, প্রতিবাসী, দেশ ও পৃথিবীর ভাই ভগ্নী সেই পাপের ভাগী হইল। এরূপ ফল কেন হইল আমরা জানি না। জানি না বলিয়া এ কথা উড়াইয়া দেওয়ার কথা নহে। তুমি একাকী থাকিলে পাপ এক গুণ থাকিত, কিন্তু যদি তোমার চারিদিকে লোক থাকে তবে উহা দশ গুণ হইবেই। তুমি পাপমদের গন্ধ ঢাকিতে চেষ্টা কর, চেষ্টা বিফল হইবে। সে পাপের গন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত না হইয়া যায় না। তুমি কাহাকেও বাহিরে কুদৃষ্টান্ত দেখাইবে না, কিন্তু তোমার ভিতরের দুর্গন্ধ বাহির হইয়া আর দশ জনকে পাপে ফেলিবে; তোমার এক গুণ পাপ দশ গুণ হইবে। তুমি নির্জ্জনে অধার্ম্মিক হইয়া সমুদ্রকূলে কান্দিলে তোমার পাপ এক গুণ থাকিয়া যাইত। সজনে অধার্ম্মিক হইলে তোমাকে এই বলিয়া অনুতাপ

করিতে হইবে, হায়! আমি কেন এত লোকের সর্ব্বনাশ করিলাম; হায়! আমি এত লোককে কেন বিষ খাওয়াইয়া মারিলাম! নির্জ্জনে থাকিলে আপনার দুঃখে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হইত; কিন্তু দেখ কত যন্ত্রণা তাহার যে দেখে আপনিও মরিল, সঙ্গে দশ জন শত সহস্র জন প্রাণত্যাগ করিল। আপনি বিষ পান করিল, আর ক্রমাগত সেই বিষে দুই শত লোকের মৃত্যু হইল। যে আপনি আপনার ঘর দগ্ধ করে তাহার দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু যে অগ্নি দ্বারা অপরের শত শত ঘর দগ্ধ করে তাহার অনুতাপ কত প্রবল হইবে?

এখন দেখ, সমাজ গঠনের কৌশল কেমন? যদি একাকী নির্জ্জনে সাধন করা যায়, পুণ্য এক এক গুণ থাকে, নিজের সাধুতার সৌরভ নিজেকেই মোহিত করে। কিন্তু সামাজিক হইয়া পুণ্য সাধন করিলে এক গুণ ধর্ম্ম দ্বিগুণ দশ গুণ হয়, সহজে পুণ্য বৃদ্ধি পায়। স্বর্গের নিয়ম আশ্চর্য্য। সিন্দুকে পাঁচ টাকা রাখিলে পাঁচ টাকা পঞ্চাশ টাকা হইল। ধর্ম্মরাজ্যের টাকা আশ্চর্য্য, আপনি আপনার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যত্ন করিয়া এই টাকা হৃদয়ে সঞ্চয় কর, ধন্য হইবে। যদি ধর্ম্ম সঞ্চয় না কর, পাপ দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে। কেবল পুণ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজ বদ্ধ হও, এবং পাপকে সর্ব্বদা ভয় কর। পাপ করিয়া কাহার সর্ব্বনাশ করিলাম, এই ভাবিয়া অস্থির হইবে। আমি যদি মিথ্যাবাদী বৈরাগ্যবিহীন ক্ষমাবিহীন হই, আমি দশ জনের অনিষ্ট করিব, এই বুঝিয়া

সদা ভীত থাকিবে। জগদীশ রক্ষা করুন যেন নিজের কুক্রীয়া কুচিন্তা দ্বারা পরকে বিষাক্ত না করি, এই বলিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করিবে।

দেখ সমাজ গঠনের কি আশ্চর্য্য অভিপ্রায়, তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য ঈশ্বর জনসমাজ গঠন করিয়াছেন। "বিষ পরিত্যাগ কর" জনসমাজের অর্থ এই। জনসমাজ গঠন করিয়া ঈশ্বর মনুষ্যকে এই বলিয়া সাবধান করিতে-ছেন, "সাবধান কেহ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিও না। অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তোমরা নিজে মরিবে, তোমাদিগের পুত্র পৌত্র ক্রমে অধর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে।" যদি বুদ্ধিমান হও, তোমাদিগের তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইবে। বিষের পাত্র ছাড়িয়া দাও, আর পাপ করিও না। সত্যকে সাক্ষী করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ কর, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, তোমাদিগের স্বজন পরিবার ভাই ভগ্নী সকলের কল্যাণ হইবে।

বিপদে ঈশ্বরের দয়া।

১২ই চৈত্র, রবিবার, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

অদ্য আর বক্তৃতার বিষয় খুঁজিবার জন্য দূর দেশে যাইতে হইবে না, ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা ব্রহ্মমন্দিরে কোটি সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আজ নাম কীর্ত্তন করিবার অপেক্ষা

নাই, পূজনীয় পরমেশ্বরের নাম করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তিনি তাঁহার অগ্নিময় আবির্ভাবে এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার করিলেন। আমরা বিরোধীগণের চরণ ধরিয়া ধন্যবাদ করিতেছি। বিরোধীগণ, তোমরা অতি বন্ধুর কার্য্য করিলে। তোমাদেরই জন্য জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা চমৎকাররূপে মনুষ্য সমাজে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তোমাদেরই জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় জগতের ঈশ্বর বিপদের সময় কেমন নিকটস্থ হন, ভক্তবৎসল হরি কেমন কোমল, কেমন প্রেম প্রকাশ করেন। বিরোধীগণ যতই আক্রমণ করে, জননী ততই সাধককে আপনার সুমিষ্ট ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন। যতই সাধকের হৃদয় আক্রমণে সন্তপ্ত হয়, ততই তিনি তাহাকে সুশীতল করেন। দেখ আজ দুঃখ যন্ত্রণা শোক বিপদ কিছুই রহিল না, রহিলেন কেবল ঈশ্বর। আজ ব্রহ্মমন্দিরে আদি অন্তে কেবল ব্রহ্মের আবির্ভাব। তিনিই আজ আমাদিগের বক্ষঃস্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

সুন্দর হরির মধুময় আবির্ভাব আরও প্রাণের সহিত ভালবাসিব এবং তাঁহার মহিমা পরাক্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগণের আর অকালে ইহলোক পরিত্যাগের ভয় রহিল না। বিরোধিগণ আজ যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন, তাহাতেই তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলেন। আজ

আমার বন্ধুগণের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। তোমরা দীর্ঘায়ু হইয়া পবিত্র ধর্ম্মের ভাব দুঃখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে সুখধাম কর। যদি তোমরা মান হারাইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন। যদি দুঃখী হইয়া থাক, ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরসুখে সুখী করিবেন বলিয়াছেন। যদি তোমাদের প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, আবার বীরের ন্যায় তোমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। যদি পাপে আক্রান্ত হইয়া থাক, অনুতাপানলে পুড়িয়া সাধু সচ্চরিত্র হইবে। যদি দুঃখের আগুণ চারিদিকে জ্বলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও ঈশ্বর তোমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে মহিমাপূর্ণ করিবেন। শত্রুগণ শত্রুতা করিয়া কি করিতে পারে? এ পৃথিবীর শত্রুতা বাস্তবিক মিত্রতা। এখানে শত্রুর ন্যায় বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটী কটু কথা সহ্য করিলে, সেই কটু কথা আশীর্ব্বাদ হইয়া মস্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন করে।

দেখ, আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, এই বেদীর ঈশ্বর, ব্রহ্মমন্দিরের ঈশ্বর, জলন্ত ভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে পশ্চাতে বিদ্যমান! আজ শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বর্গীয় আবির্ভাবে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে। আর কেন আমি এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইব? এই যে আজ আমাদের ঈশ্বর করতলস্থ বস্তু হইয়া আছেন। বিরোধিগণ আগুণ জ্বালিয়া

কি করিবে? আমরা ব্রহ্মের ক্রোড়ে রক্ষিত হইব। আমাদের ভাইগণ আমাদিগকে কটূ কথা বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি হইল? তাহারা না বুঝিয়া আমাদিগকে অপমান করিল তাহাতেই বা চিন্তা কেন, ভাবনা কেন? তাহারা আক্রমণ করিয়া কি আমাদিগের মন সন্তপ্ত করিতে পারে? কৈ হৃদয়ে কটূ কথার তো একটু চিহ্নও নাই। আমরা কি তাহাদিগের আক্রমণে হৃদয়ের শান্তি বিসর্জ্জন দিতে পারি! আমরা যত কান্দিব, তত শান্তি উপার্জ্জন করিব। আমরা এই শান্তি ফেলিয়া যদি সংসারের প্রচুর মান সম্পত্তি পাই, তবু তাহা গ্রহণ করিব না। সকল অবস্থায় আমাদের এই শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। যদি অশান্ত হই তবেই আমাদিগের ক্ষতি। মাতাকে শান্তি প্রেমের আধার করিয়া সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে যত্নের সহিত রাখিব।

দেখিও প্রাণ যেন কখন মলিন না হয়। মলিন হইল বলিয়া যদি ভাই বন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। হৃদয় বা মলিন হয় এ বিষয়ে চিরকাল ভয় রাখিবে। ক্রোধপূর্ণ নয়নে কাহার পানে তাকাইও না। যে ব্যক্তি শান্ত ভাবে সমুদয় বহন করে তাহার মস্তকে অমৃত বর্ষণ হয়। বিরোধিগণের প্রতি সর্ব্বদা দয়া রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তাহারা জানে না কি করিতেছে। তাহারা বিরোধ দ্বারা পুণ্য পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আমরা জানিতে পারিয়াছি বিরোধও ঈশ্বর সৃজন করিয়া থাকেন।

সম্পদ বিপদ সকলই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। একদিকে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিবে, আর একদিকে নীচে যাইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুণে পুড়িতে হইবে। ব্রহ্মের বিধান এই, এ বিধান অতিক্রম করিতে পার না। বিধাতার বিধি আজ আরও অধিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। দেখ বিরোধের ভিতরে কেমন চমৎকার রং, আক্রমণের ভিতরে কেমন অপূর্ব্ব সুখ সম্পদ। বিরোধ পাঁচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অল্প সময়ের জন্য, কেন না ইহার মধ্যে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়। আক্র-মণ বিরোধের মধ্যে যে বলের সহিত বলিতে পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রহ্মের প্রবল জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, সে কথন ব্রহ্মে বিশ্বাসী নহে। প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরো বর্দ্ধিত হয়। আগে সামান্য ভাবে চারিদিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ব্রহ্মের জ্যোতিঃ কেমন জলন্ত ভাবে প্রকাশিত! কেমন সত্যের সাক্ষী হইয়া বিদ্যমান! চারিদিকে আগুণ জ্বলিয়াছে, দেখ ভিতরে কেমন পুষ্পের সুকোমল শয্যা। বাহিরে এত আগুণ, অথচ প্রাণ কেমন শীতল হইতেছে। যত তোমাদের প্রতি আক্রমণ হইবে, তত শীঘ্র শীঘ্র তোমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া শীতল হইবে। বিরোধিগণ রণস্থলে যখন মার মার করিতে থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে তোমরা ধ্যানে নিমগ্ন হইবে, অন্তরে সুন্দর পুষ্প সকল ফুটিবে, তরু পল্লব লতাতে হৃদয়

মনোহর ভাব ধারণ করিবে। তখন বুঝিবে ব্রহ্মের কেমন মহিমা!

প্রিয় সাধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত বিপদে পড়িয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সুখে বসিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন ; সেই দৃষ্টান্তের কবচে আমাদিগকে আবৃত কর। ঈশ্বর যাহাদিগের আশ্রয়স্থান, তাহাদিগের কোন ভয় নাই। ঈশ্বর কখন ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বরের চরণ যখন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি যে উহা ছাড়াইয়া লয়। যে প্রাণনাথের চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে সুখের স্থানে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে কোন প্রকারে দুঃখ দিতে পারে না। সাধককে দুঃখ দেয় পৃথিবীতে এমন কে আছে? যখন সাধক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসী মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়া থাক। বিশ্বাসীর দুঃখ কোথাও নাই। আপনি আপনার দুঃখের কারণ হইতে পার। অপরে কখন তোমাদের দুঃখের কারণ হইতে পারে না। ঐ দেখ, সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, আমাদিগকে সকলে ছাড়িয়া দিল, যাই এই কথা বলিলে ব্রহ্ম হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি। এই আজ আমাদিগকে হাসাইলেন কে? আজ যাহারা দুঃখ দিতে আসিল তাহাদিগকে সহজে হারাইলেন

কে? কেহ কি আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিল? আজ এই বিরোধের অবস্থায় যে রত্ন হাতে পাইয়াছি, যত্নের সহিত তাহা বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া আমরা সুখে দিন যাপন করিব। পরে কেহ আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিবে না। যদি অধর্ম্ম করি তবেই দুঃখ। মনুষ্যের কটূ উক্তি কখন আমাদিগের হৃদয় ভেদ করিতে পারিবে না। যত বিষাক্ত বাণ আমাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে, অমৃতবিন্দু হইয়া উহা আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। তোমরা শান্তভাবে বসিয়া থাক, আর অন্যের দুঃখ দেওয়ার যত্ন দেখিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পরিহাস কর। যদি দুঃখ আইসে তোমাদের এক গুণ বিশ্বাস দশ গুণ হইবে, দশ গুণ শান্তি এক শত গুণ হইবে। তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাক, ব্রাহ্মসমাজের কখন অমঙ্গল হইবে না। দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, তাঁহার নাম স্মরণ কর, সাধন ভজন কর। ইহাতে এই হইবে, দুঃখ বিপদে দুঃখ দিতে পারিবে না। যাহারা আজ অল্প বিশ্বাসী আছে, তাহারা পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে; যাহারা মরিবে বলিয়া শশ্মানে যাইতেছে, তাহাদিগকে জাগ্রৎ জীবন্ত জলন্ত দেখিতে পাইবে। সাধন ভজনে দুঃখী সুখী হয়, অসহায় সহায় পায়, নিঃসহায় প্রচুর ধন লাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপদে ঘেরিলে ধ্যান আরও ঘনতর হয়। যত লোকে করতালী দিবে, তত তোমরা আরও আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিবে। বাহিরে যত কটূ কথা শুনিবে, হৃদয়ে তত ব্রহ্মের মধুর কথা শুনিবে। বাহিরে যত

অন্ধকারে ঘেরিবে ততই অন্তরে উজ্জ্বল ব্রহ্মরাজ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের বিরোধকে আক্রমণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরাজ্যে বসিয়া থাকা চাই। যেখানে বসিয়া থাকিলে অধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লাভ হইবে। সমুদয় অভদ্র তিরোহিত হইবে। বন্ধুগণ! ব্রহ্মে লীন হও, আরো তাঁহাকে ভালবাসিতে থাক, সুখ শান্তি তোমাদেরই।

আমার আচার্য্যপদে নিয়োগ ঈশ্বর প্রদত্ত মনুষ্য প্রদত্ত নহে।

২৩এ বৈশাখ, ১৮৮০ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ! যখন তোমরা গত রবিবার প্রণয়ের সহিত প্রেমের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আসন পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী রবিবার কয়েকটা কথা বলিবার ইচ্ছা করি, সেই কথা আজ শুনিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে জীবনের দুপাঁচটী কথা বলিতে পারি; জীবনে সময়ে সময়ে যাহা অনুভব করিয়াছি, গূঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আজ একটী বিশেষ কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর আমাকে ডাকিলেন এবং এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার সেই কথা শুনিলাম। সেই সময় হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন হইল। যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ করা হইল, তখন ইচ্ছা হইল যে, পাপে তাপে অধীর হইয়া সংসার অরণ্য মধ্যে যাঁহাকে ডাকিব তিনি কোথায়, তিনি কেমন ভালবাসেন, সজীব ভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার জীবন্ত পরমেশ্বর চাই। আমি এমন একজনকে ধরিব, যাঁহাকে ধরিলে আমার জীর্ণ তরী ডুবিবে না। আমার দীক্ষা গুরু প্রার্থনা, মনুষ্য নয়। তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস কর অনুরোধ করিতেছি। আমার দীক্ষা গুরু প্রার্থনা, এই প্রার্থনাকে অবলম্বন না করিলে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পূজা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলাম। সময়ে সময়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম। ইহাতে কি শিখিলাম? কখনও ঘরে কখন ছাদের উপরে বসিয়া সরল ভাবে মানুষকে যেমন মানুষে জিজ্ঞাসা করে, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া জীবনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম।

অনেক সময়ে মানুষের প্রার্থনা কল্পনার ব্যাপার হয়; এজন্য আশানুরূপ প্রার্থনার ফল দেখিতে পাওয়া যায়

না। প্রার্থনায় কল্পনা থাকিলে ঘোর বিপদ হয়, সুতরাং প্রার্থনা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে, এই বিশ্বাসে পদে পদে গুরুকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন হইল। ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত করা যাইতেছে, তাহা ঠিক ধর্ম্মের অনুমোদিত হইল কি না; যে সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে সেগুলি প্রকৃত কি না জানি না। উপধর্ম্মবাদীগণ গুরু ও ধর্ম্মপুস্তক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া থাকেন, মানুষের উপদেশ শুনেন।

যেদিন হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম সে দিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। সুতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল। সংসারের সুশৃঙ্খল করিতে হইবে, গুরুজনের নিকটে লোকে শিক্ষা করে; কোন বিষয়ে সৎ পরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করে; কোন্ পুস্তক পড়িতে হইবে তাহা জ্ঞানীর নিকটে জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে সুশৃঙ্খলা না হইয়া অনেক সময়ে বিশৃঙ্খল হয়; সৎ পরামর্শে অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান করে। এ সকল ঠিক হইতেছে কি মন্দ হইতেছে কে বলিবে? এই সকল ভাবিয়া ব্রহ্মের পাদপদ্ম ধরিলাম, তাঁহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদয় মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলাম। পথে চলিতেও আবশ্যক হইলে তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না।

মানুষকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলে সে বিরক্ত হয়, এত বড় মহান্ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব, এ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি যাহাতে বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে সকলি বৃথা হইয়া যায়। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া না লওয়া যায়, তবে একজন ক্রমাগত পাঁচ বৎসর বিপরীত পথে চলিতে পারে এবং কল্পনার কাজ করিয়া পরিশেষে মহা বিপদে পড়িতে পারে। সুতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই সময় পথে ছাদের উপরে, ঘরে, বিপদের সময়, সম্পদের সময়, সংসারের কার্য্য করিবার সময়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে যাইতাম এবং তাঁহার কথা শুনিতে চেষ্টা করিতাম। তাঁহার উত্তর শুনিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, উত্তর না পাইয়া ডাকিলে কেহ কি কখন সুখী হয়? কাণাও যদি ডাকিয়া উত্তর পায়, তবে কি সে সুখী হয় না? ফলতঃ জওয়াব চাই, জিনিষ চাই। যতক্ষণ না তাঁহার উত্তর পাইতাম বসিয়া থাকিতাম।

প্রথমে ব্রহ্মের স্পষ্ট উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু বুঝিলাম ব্রহ্ম হাসিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে অল্প অল্প তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সময় এমন হইয়াছে, কোন স্থানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে যাও বলিলে তবে গিয়াছি। অমুক লোকের বাড়িতে যাও বলিলেন, সেখানে গিয়া অমূল্য সত্য লাভ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছি।

ক্রমে জীবনের ইতিবৃত্তে দেখা গেল ছোট ছোট বিষয়েও ঈশ্বরকে ডাকা ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নূতন নূতন পথ দেখিতে পাইলাম। অনন্তর একটি ভারী ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সময়ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টার পদ আচার্য্যের পদ পাইলাম। ব্রাহ্মদিগের কাছে এই পদ পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যা মিশ্রিত কথা। কোন মানুষ আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পারে না। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাহাতে তাঁহারই স্বাক্ষর, যিনি ছাদের উপরে ঘরে আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কার্য্য করা একটি লোভের ব্যাপার। মনে করিও না, ইহার জন্য দুই পাঁচ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাসা করিলে, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে এই এই উত্তর দেওয়া যায় কি দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব কি পড়িব না? অমুক কর্ম্ম করিব কি করিব না? প্রথমতঃ হাঁ কি না এইটি শুনিবার বিষয়। ক্রমে জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। অনেকে এইরূপে সাধন আরম্ভ করিলে ক্রমে আদেশ শুনিতে পায়। সে যাহা হউক যখন এই ভার পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর যখন বসাইলেন তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না। ক্রমে

ঈশ্বর সেই সকল গুণ দিতে লাগিলেন, যাহাতে এ কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাতে উপযুক্ততা নাই, এই বলিয়া কি ঈশ্বরের কথা শুনিব না? যদি তিনি আমায় আচার্য্যের কার্য্য দিলেন, তবে আমার সংস্কার যে প্রকার হউক না কেন, আমি কেন সঙ্কুচিত হইব? পথে ঘরে ছাদে যাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি, তিনি যখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকট ইহা ঘরের কথা বলিয়া মনে হইল। যিনি আমায় প্রতি দিন অন্ন ব্যঞ্জন দেন, তিনিই আমায় বেদীতে বসিতে বলিলেন, সুতরাং আমি ইহাকে ঘরের কথা মনে না করিয়া আর কি মনে করিব? উপাসনার সময়ে তাঁহার সঙ্গে যেরূপ বার বার কথা বলিয়াছি, সেই কথাই সকলকে বলিব, সুতরাং ঘরের কথা বলিতে আর সঙ্কোচ কি? আমি সাধারণও বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা বলিবার তাহা বলিব। আজ এই কথা বলিলাম ইহাতে ব্রাহ্ম-সমাজ যদি চূর্ণ হয়, চারিদিকে গ্লানি নিন্দা হয় হউক, আমি সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। আর সত্যকে গোপন করিলে চলে না।

আমি যদি ব্রহ্মের ভৃত্য হই, তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হই, তাঁহার অন্ন পান দ্বারা যদি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই হইবে। তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জানাইলেন। অমুক স্থানে যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর,

তিনিই আজ্ঞা করিলেন। সে কালে আমি তোমার কথা শুনিব না, এ বলিয়া তাঁহার সে আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, এ আদেশটিও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি একটি আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম, আর একটি আজ্ঞা ছাড়িব কি প্রকারে? যিনি ধন ধান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেবা করিতে বলিলেন, কেন সেবা করিব না? এই জন্য খাওয়াইয়া পরাইয়া তিনি কি মানুষ করিলেন? মানুষের কথা শুনিয়া কি তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিব? আমার মানুষের কথায় প্রয়োজন নাই। মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে। আমি কোন দিকে তাকাইব না। যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন, তখন এই বুঝিলাম, এ আমার মরণ বাঁচনের কথা। যদি এই কাজ গ্রহণ করি বাঁচিব, যদি না করি মৃত্যু হইবে। আমি মরিব না বাঁচিব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। মরিব না, বাঁচিব এই স্থির করিয়া বলিলাম, "যে আজ্ঞা প্রভু, আমি তোমার আদেশ পালন করিব।" বাঁচিবার জন্য জীবিকার জন্য আমার এ কর্ম্ম করিতে হইবে। নিয়োগ পত্রে যে ভার আছে তাহা উপহাসের বিষয় নয়, আমায় প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। তত বড় প্রকাণ্ড ভার কি প্রকারে সম্পাদন করা হইবে? ঘটী হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা দূর করা যেমন সহজ, ইহাও তেমনি সহজ। এত বড় ভার একটি ছোট ভাণ্ড হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার হইল, বুঝি ভারি ভার বহন করা হইল। অহঙ্কারের

বিষয় কিছুই নহে। যখন ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে আসিল ভাবনা কি? কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথা শুনিয়া দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন, "আমি ভারের কাজ করিব।" যদি তিনি না করেন, মৃত্যু। মনে হয় এটি একটি প্রকাণ্ড ভার। এত বড় একটি সমাজ সংস্কারের কার্য্যে অনেক জ্ঞান চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম্ম চাই। এ সকল কথা কিছুই নয়! আমি পুনরায় বলিতেছি জল খাওয়া যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনি সহজ।

ফলতঃ প্রচার করিব না হয় মরিব এই মূল কথা। এই প্রচার যত্নসাধ্য নহে; সহজসাধ্য। যদি কেহ বলে তুমি তো ইহার উপযুক্ত নও, তোমার তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি তোমার কুসংস্কার অনেক। উপর হইতে অমনি ইঙ্গিত হইল "এ কথা ফাঁকি দিবার কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্ণপাত করিও না।" এই কথা বলিয়া কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়। মানুষের কথায় আমি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত বুঝিতে চাই না। যদি অনুপযুক্ত হই; তবে আমার কি, নিয়োগকর্ত্তার দোষ। বেদী হইতে আমি যাহা বলিব তাহাতে পৃথিবীর লোক সুখ্যাতি কি অখ্যাতি করিবে আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ রোপন করিব, কে

জানে তাহার ফলাফল। পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয় আমি সেই উপাসনা বিতরণ করিতে চাই। এ সকল কথায় প্রয়োজন কি, এ প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে।

যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি একটি যোগ্যতা আছে, এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ। কি বিষয়ে? না, আমি ভালবাসি। যে ভালবাসে সেই চাকর হয়। ভৃত্য হইলেই ভালবাসিতে হয়। লোকে ভৃত্যকে ভালবাসে ভৃত্যও প্রভুকে ভালবাসিয়া থাকে। সময়ে সময়ে ভাবি আর মনকে বলি, মন তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি তুমি কি ভালবাসিয়া মরিতে পার? ভালবাসিয়া মরিতে পারি এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জ্বল আছে। শত্রু আক্রমণ করিলে, কোটী কোটী লোক আক্রমণ করিলে, খড়্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও প্রগাঢ় প্রাণের ভালসাসা যায় না; প্রগাঢ় ভালবাসার মধুরতা কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটি ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ব্ববিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, আমার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। পরকে ভালবাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা ভালবাসার দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল আর স্বভাব বল যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু এ

ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করি নাই। আমি এ ভালবাসা মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি! ভাল-বাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে ভাই ভাবিলাম, এখন আর ছাড়িতে পারি না; এখন আর উপায় নাই। কাট আর মার যাই কর, কার্য্যে থাকিতেই হইবে। যদি তোমরা অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পার, ঐ অমুক ব্যক্তি কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁহার পূজা করিব। তাঁহাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানিয়া তাঁহাকে আপন বেদীতে বসাইব। কিন্তু ভাই তোমরা একটী কাজ করিও আর একজন যে, প্রাণের সহিত ভালবাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তাহাকে আনিও। আমি সরল মনে বলিতে পারি আর কেহ নাই যে আমার মত তোমাদিগকে ভালবাসে। যত দিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে যত দিন রক্ত আছে, তত দিন দস্যুর হাতে রাক্ষসের হাতে প্রিয় ভাই ভগিনীগণকে সমর্পণ করিব না। আমা অপেক্ষা বা আমার সমান একজন লোক ভালবাসে বলিয়া দাও, দেখ আমি তাহাকে সমুদয় ভার দিই কি না? আমি তোমাদিগের নিকট ঋষি বা মহর্ষি চাই না, তোমাদিগের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিবে, প্রচারকগণ এবং তাহাদিগের পরিবারের মুখে যদি অন্ন না যোটে তবে কাঁদিবে এমন একজন চাই। যদি বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে, আমার অস্থির মধ্যে শোকের চিহ্ন আছে

কি না ? প্রাণেশ্বর যদি বলেন অমুককে তোমার স্থানে প্রেরণ করিলাম, অমনি আমার জীবন শেষ হইবে, প্রাণত্যাগ করিব, আমার কর্ম্ম কাজ তখনি ফুরাইবে। আর একজন আমার ভাই ভগ্নীদের জন্য কান্দিবে ইহা বুঝিলেই আমার সমুদয় কার্য্য শেষ হইবে।

দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয় কার্য্য করিতে কার্য্যালয়েও যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে। আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই। বল আমি ২৪ ঘণ্টা বসিয়া কি করি। কেবল আমার হৃদয়ের পুত্তুলগুলিকে সাজাই কাপড় পরাই, প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত্ন আমার মাণিক বন্ধুগণ। রাত্রি দুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধু-গণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় একাকী কি প্রকারে থাকিব। ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, আমি যখন তাঁহাদিগকে ভাবি, আমার মনে কত আনন্দ হয় আমি কাহাকেও বলি না। ভাইয়েরা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদিগের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ এই আমার কার্য্য। এই জন্য এখনও আছি, এই জন্য

এখনও থাকিব। সকলে বলুন আর না বলুন সেবা করিব এই উপরের আজ্ঞা। বিবাদ করিতে চাও কর, আমি মনকে ঠকিতে কখন দিব না। কেন না আমার এ ঘরের কথা। আমার এ কথাতে তর্ক বিতর্ক আসিতে পারে না। কি সম্পর্কে আমি কার্য্য করিব—একজন ভালবাসে এই সম্পর্কে। কেহ অহঙ্কারী বলিতে চাও বল, তবু এ কথা বলিতে ছাড়িব না। আমার ঘরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গের কথা, তাই এ কথা বলিলাম।

চোরের ব্যবসায়।

৩০এ বৈশাখ, রবিবার, ১৮০০ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

স্থল বিশেষে মনের কথা খুলিয়া বলাতে দোষ নাই। যখন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল, তাহার এক জন বাড়িল; যত প্রতারক বাস করিতেছিল, তাহার একজন বৃদ্ধি হইল। ইহা পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, ইহার ফল যাহা হইবার তাহা ভবিষ্যতে হইবে, তবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু একজন চুরি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। "সন্দেহ নাই" বলের সহিত বলিতেছি, কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে

না; নিশ্চিত প্রতিবাদ করিতে পারে না। ইহার সাক্ষী শত্রুগণ এবং মিত্রগণ। শত্রুদলও বলেন মিত্রদলও বলেন এ কথা সত্য। একজন ভারি প্রবঞ্চক যশোমান লাভের প্রত্যাশায়, সাংসারিক শ্রী বৃদ্ধি সাধন করিবার ইচ্ছায়, আপনার ঐহিক অভাব মোচন করিবার জন্য, নানা প্রকার কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে। একজন লোক নানা প্রকার নিগূঢ় কৌশলে গূঢ় ভাবে মনুষ্য সমাজে প্রবেশ করিতেছে, নগরে গিয়া কখন নিজ নামে কখন বিনামী করিয়া লোকের হৃদয় চুরি করিতেছে। শত্রু মিত্র দুয়ের কথা ভিন্ন প্রকার কিন্তু মূলে এক। শত্রুরা একজন চোরের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যে ব্যক্তি কপট ধূর্ত্ত বিষয়ী, যাহার ভিতরে এক, বাহিরে এক, সংসার অন্তরে, বাহিরে সাধুতা, অন্তরে বেশ ভূষার বাসনা, বহ্যিক শোভাতে যোগী এবং ধার্ম্মিক, মুখে তপস্যা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে সেবা, মস্তক অবনত, সুতরাং শরীরের বাহ্যিক লক্ষণে ভক্ত এবং যোগী বলিয়া গণ্য; ভিতরে বিষয়ের গরল, বাহিরে নিস্পৃহের ভাব। ঈশ্বর ইহার উপলক্ষ, সংসার লক্ষ্য। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর। আমিও বলি এ ব্যক্তি চোর, কিন্তু অন্য ভাবে, অন্য লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়।

আমি আমাকে চোর বলিতেছি, বিরোধীদল যে চোর বলিতেছে তাহাদের কথা খণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ

ব্যক্তি যথার্থ কোন্ প্রকারের চোর তাহার বিচার ভবিষ্যতে হইবে। এই বেদী হইতে সাব্যস্ত করা যাইতেছে, একজন চোরের জন্ম হইয়াছে। শত্রু মিত্র, এ দুয়ের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে যোগ দিতে পারি, আমার দ্বারা চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাও বলিতে পারি। কিরূপে কি কৌশলে চুরি করিব চিত্ত ভাবিতে লাগিল। চোরের ব্যবসায় চোরের কৌশল লইয়া কোন স্থলে কিরূপে কার্য্য করিলে ব্যবসায় চলিবে চিন্তা হইল। একটি অভ্যাস ছিল, সেটি এই ; ব্রহ্ম বলিয়া একজন আছেন, তাঁহার মুখ দর্শন করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, ঈশ্বরের নিকট উত্তর শুনিতাম। আজ বলিতেছি। তাকাইতাম আর এখানে ওখানে উপরের দিকে সমক্ষে পশ্চাতে সুন্দর মুখ দেখিতাম। ঈশ্বরের মুখ চিরসুন্দর। কলিকাতা সমাজে বিষ্ণু গান করিত "ভুলো না চিরসুন্দরে।" চিরসুন্দর কে? আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাই না? মানুষ নন, নিরাকার, ইহাতে আর ভুল নাই ; কিন্তু "ভুলো না চিরসুন্দরে" যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, দেখ তিনি কাছে কি না? চক্ষু তুলিলাম, একজনার মুখ দেখিলাম, সে মুখ আর ভুলিবার নহে। মুখ দেখিলাম ইহাতে আর ভুল নাই আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি ইহা যেমন সত্য বলিয়া মানি, এ মুখ দেখা যায় আমি তেমনি সত্য বলিয়া মানি। এই সেই মনোহর রূপ ঘরের মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে নিকটে। সেই এই মুখ জীবনের বস্তু, সেই এই

শীতল সুকোমল পদ জীবনের সার ধন। এই মনোহর জিনিষ আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি ; দেখিয়া বুকের ভিতরে রাখিয়াছি।

ঈশ্বর দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। ছেলেমানুষের মধ্যে প্রথা আছে একজন আহ্লাদিত হইলে দশ জন আহ্লাদিত হয়। একজন যদি হাঁ করে আর দশ জন দর্শক অজ্ঞাত-নুসারে হাঁ করে। একজনের মুখ ম্লান হইলে তার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের মুখ ম্লান হয়। তেমনি যদি একজনকে হাসিতে দেখা যায়, নিজের মুখও হাসি হাসি ভাব ধারণ করে। যখন দেখিলাম সেই মুখ কখন কখন ঈষৎ হাস্যযুক্ত হয়, তখন আমারও মুখ মনোবিজ্ঞানের নিয়মে ঈষৎ হাস্যের ভাব ধারণ করিল! তাঁহার মুখ হাসিতেছে, সুতরাং আমার মুখও হাসিল। সার কেবল এই হাসি মুখ। ঐ মুখ দর্শনেই চুরির কৌশল শিখিলাম। মুখ দেখিলাম দেখিয়া সুখী হইলাম। এই মুখ দেখিবার জন্য চুরি করিতে হয়, চৌর্য্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। পৃথিবীর ইহাতে সায় নাই। কেবল বিপদকালে নিকটে বসিয়া বলিলাম, "মুখ দেখাও" "আর একটিবার দেখাও।" দুঃখ বিপদে সন্তপ্ত প্রাণে তোমার কাজ ভাল লাগে না তোমাকে দেখিতে চাই। যাই আনন্দ মুখ দেখিলাম, চক্ষু হইতে জলধারা পড়িল, প্রাণ শীতল হইল, অত বিপদ দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। যাহাতে দর্শন ঘনীভূত হয় তাহার উপায় ধ্যান তপস্যা যোগ। কিন্তু এ সংক্রান্ত একটি কথা আছে। আমার অনেকক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘ-

কাল তাঁহার দিকে তাকাইতে পারি নাই, নৈমিত্তিক দর্শন হইয়াছে। একবারে একটি নিমেষ, পল, বা অর্দ্ধ মিনিট দর্শন হইল আর হইল না। ইহাতে বোধ হয় দর্শন পলকের জন্য হয়, ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট ২ মিনিটের জন্য হয় না। কিন্তু ঐ যে পলকের মত দর্শন, ঐ বিন্দুই সিন্ধুপ্রায় হয়। পলকের দর্শন ভিন্ন মনুষ্যের হয় না, পাপী জীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহাই বহুমূল্য রত্ন। একটিবার দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ একবার দুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চার হয়; জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই সুখ সকলেরই অর্জ্জন করা আবশ্যক। তাঁহার কথা শুনাও উচিত, তাঁহাকে দেখাও উচিত। দেখা শুনা, শুনা দেখা, একবার দেখা, একবার শুনা, একবার রূপ দর্শন করিলাম একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিলাম, এই দুইটী ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র হয়। দর্শনের কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহা কি দুর্লভ? এই যে তিনি আছেন ইহা যদি বলিতে না পারিলে তবে দর্শন বহু দূরে। বিনা চেষ্টায় এখনি যদি বলিতে পার এই তিনি আছেন, তবে হইল, নতুবা বুদ্ধির দ্বারা ভাবিতে লাগিলে আর তিনি চলিয়া গেলেন। বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তি চক্ষে এই তুমি এই আমি সহজ পরিচয়।

এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে, সুখী করিতে হইবে;

এই আনন্দ এবং মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া, দুর্ব্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া কেহ সে কথা শুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ় ভাবে দুই জন পাঁচ জন দশ জন কুড়ি জনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার করা হইল। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষন এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাহারা সংসারের রাজ্যে পথিক, তাঁহারা এক জন দুই জন তিন জন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগান আছে। এই জালে যাহারা না পড়িয়াছেন তাঁহারা অনেক দূরে আছেন, এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে কেহ তাঁহাদিগের কিছু চুরি করিতেছে। জীবন আছে ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, একজনের হস্তে এখনো সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত মত যে কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। একজন লোক চুরি করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক বা না হউক, সকলের উপরে চুরি চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরি করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর বিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

ঈশ্বর চোরের কার্য্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমন সতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে এ চুরী বন্ধ করিতে পারে। চোরের কার্য্য চলিল, স্বয়ং ঈশ্বর চোরের কার্য্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। এত আন্দোলন অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি! কিসের জন্য? এই জন্য যে জানি যে যে একবার পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। কেহ নূতন দল স্থাপন করিতে চান, দলাদলী করিতে আরম্ভ করেন, করিয়া কি করিবেন? প্রত্যেক প্রভারক অর্থাৎ প্রচারক এ কথা নিশ্চয় যে দলাদলী স্থাপন করিতে পারেন না। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যদি মনে হয় যে তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন; জানিও যে তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন না, ঘরেতেই রহিলেন। যদি এক সহস্র ক্রোশও কেহ চলিয়া যান যাউন, হস্ত পদ বান্ধা রহিয়াছে। প্রেম দ্বারা ঈশ্বর যাঁহাদিগকে ধরিয়াছেন, তাঁহারা কোনরূপে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। একবার যাহারা পরিবারের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহারা সে সূত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহারা ঈশ্বরের প্রচারের ব্রতী হইয়াছে তাহারা প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক একজন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরি করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাহারা এরূপ কার্য্যে

নিযুক্ত তাঁহারা কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক প্রাণ ইহা কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শত্রু হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এই জন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে তাহারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে, সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না। যিনি একবার বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষঃস্থলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ আছেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। চোরের ব্যবসায় মহদ্ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন দূরে গেলেন, তাঁহাকে কি ছাড়া যায়, তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বদ্ধ আছেন। চুরির শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না। ব্রহ্ম নামের সুধা জগতের লোককে দিয়া প্রমত্ত করিয়া তাহাদিগের চিত্ত হরণ কর, দেখিবে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি ব্রাহ্মের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন থাকিবেন।

বিচিত্রতা।

১৫ই বৈশাখ, রবিবার, ১৮০১ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

বিশ্বরাজ্যে কেবলই বিচিত্রতা। বিচিত্রতা, ভিন্নতা জগতের সৌন্দর্য্য। যেখানে বিচিত্রতা নাই সেখানে ঈশ্বরের হস্ত নাই। ভূলোকে দ্যুলোকে সর্ব্বত্র কেবলই বিচিত্রতা। এক ঈশ্বরের হস্ত হইতে কিরূপে এমন বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইল? মনুষ্য এই বিচিত্রতার মধ্যে স্রষ্টার কৌশল দেখিয়া স্তব্ধ হয়। যদি ভৌতিক জগতে বিচিত্রতা সৌন্দর্য্যে হেতু হইল, তবে ধর্ম্মজগতে বিচিত্রতা কেন না থাকিবে? সকলের মুখ বিভিন্ন প্রকার, তবে সকলের আত্মা কেন বিভিন্ন না হইবে? কি ধর্ম্মজগতে কি ভৌতিক জগতে বিভিন্নতা অনিবার্য্য। চেষ্টা কর সকল নক্ষত্রকে এক প্রকার করিতে পারিবে না, চেষ্টা কর সকল মনকে এক প্রকার ভাবে গঠন করিতে পারিবে না। দশ জন মনুষ্যকে সব যত্নপূর্ব্বক এক প্রকার শাসনের অধীন রাখ না কেন সেই দশ জন মনুষ্য দশ প্রকার চরিত্র লাভ করিবে। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে তাহাদিগের সংস্কার ভাব, গতি, রুচি বিভিন্ন। ঈশ্বর বলিয়াছেন ধর্ম্মরাজ্য এক হইও না, বিভিন্ন হও। আমরাও ধর্ম্মরাজ্যে বিচিত্রতা দেখিতে অভিলাষ করি; বিভক্ত দলকে অভ্যর্থনা করি। যেমন যদি বীজ অবিভক্ত থাকে, তাহা হইলে

তাহা হইতে শস্য বৃক্ষ জন্মে না, সেইরূপ ধর্ম্ম যদি ভিন্ন ভিন্ন দলে না ভাঙ্গে তাহা হইতে নূতন নূতন সহস্র প্রকার ভাব উৎপন্ন হয় না। যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারাই ধর্ম্মকে সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ রাখিয়া বলে, সাবধান, সাবধান, ধর্ম্মকে বিভক্ত হইতে দিও না। তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। যথার্থ ধীর ব্যক্তিরা বলিবেন, স্বর্গ হইতে সুধার কলস আসিয়াছে, ইহা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে যে রত্ন আছে তাহা বিভাগ কর। না ভাঙ্গিলে রত্ন পাইবে কিরূপে? সুধাপাত্র ভাঙ্গিয়া লোকে তাহা হইতে সুধা লইয়া নানারূপে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে! শস্য ক্ষেত্রে বপন করিলে ভাঙ্গিয়া সহস্র লোকের আহারের আয়োজন হয়। এক জল কত স্থানে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া জীবদিগের অভাব মোচন করিতেছে। যাঁহারা জল বিভাগ করিতে জানেন তাঁহারা জানেন জলের ভিতরে কি কি বস্তু আছে। যদি পৃথিবীতে এক দল সাধন থাকে, আমার ইচ্ছা, ব্রাহ্মবন্ধু, তোমারও ইচ্ছা যে সেই সাধকদল সহস্র প্রকারে সাধন করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে সকলেই এক প্রণালী অনুসারে সাধন করে। অন্ধেরা যেমন সৃষ্টির বিচিত্র বস্তু সকল দেখিতে পায় না, কেবল এক প্রকার অন্ধকার দেখে, ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে সেইরূপ অন্ধতার একতা স্থাপন করিতে চাহেন না। আমরা অন্ধতা এবং মৃত্যুর ঐক্য চাহি না। জীবন্ত ব্যক্তি যাহারা, তাহারা বিচিত্রতাকে অভ্যর্থনা করে।

যাহাদের চক্ষু আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ দেখিবে এই বস্তু, কেহ দেখিবে ঐ বস্তু। জীবন্ত মনুষ্যদিগের কার্য্য-প্রণালী, চিন্তাপ্রণালী, আশার প্রণালী, এ সমস্ত বিভিন্ন হইবে। ঈশ্বরের হস্ত রচিত স্বভাব বিচিত্রতা চায়। সেই স্বভাবের উপর এক খানি প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপাইয়া দিও না। সূর্য্য চন্দ্র হইবে না, ভক্ত যোগী হইবে না, অতএব আমরা এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সাধনের বিচিত্র পথ যেন অবরুদ্ধ না করি। যাহারা বলে আমাদের যে মত তোমাদিগকেও ঠিক সেই মত অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারা ধর্ম্মের গূঢ় উদার তত্ত্ব জানে না। যাহারা পরস্পরের অনুকরণ করে তাহারা অন্ধ, তাহারা মৃত। যদি আমাদের অধোগতি হয়, যদি আমরা মৃৎপিণ্ড হই, তাহা হইলেই আমরা বিচিত্রতা বিহীন হইব। যদি জীবন থাকে, যদি চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে আমরা বিচিত্র পথে ধাবিত হইব, এই ঈশ্বরের আজ্ঞা। তোমার রুচি আমার রুচির সঙ্গে মিলিবে না, তোমার সাধন প্রণালী আমার সাধন প্রণালীর সঙ্গে মিলিবে না। তুমি জ্ঞানী ব্রাহ্ম, আমি মূর্খ। তুমি এক দেশীয় আমি এক দেশীয়। আমি যদি তোমাকে বলি তুমি আমার মত লও, তবে আমি ভয়ানক অত্যাচারী মনুষ্য। আমি যদি ঠিক ঈশ্বরের অনুগত দাস হই, তাহা হইলে আমি কখনও কাহার স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া তাহাকে আমার পথে আনিতে চেষ্টা করিব না। সকলকে সত্য দিব, সকল হইতে সত্য গ্রহণ করিব, কিন্তু কাহারও স্বাধীনতার

উপরে হস্তক্ষেপ করিব না। আমার ইচ্ছা, বোধ করি তোমাদের ইচ্ছা, আমরা এই বিচিত্র সাধন গ্রহণ করি। প্রতিজনের পক্ষে তাহার রুচি এবং ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তোমরা মনে করিয়া থাক সকল সাধকেরাই এক প্রকার হইবে; এই পৃথিবীতে কোন একটি ব্রহ্মমন্দির থাকিবে, আর মন্দির হইবে না, এই মন্দির অদ্বিতীয় থাকিবে, তবে তোমরা মনুষ্য প্রকৃতি জান না। ঈশ্বর বিচিত্রতা প্রিয়। তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে নূতন সাধন প্রণালী সকল প্রকাশিত হইবে; নূতন শ্রেণীর লোক সকল আসিবে। তোমাদের পুত্র পৌত্রেরা তোমাদের মতে থাকিবে না। যাহারা মনে করে বংশ পরম্পরায় এক রকম চলিবে, তাহারা মনুষ্যকে পশুর ন্যায় মনে করে, তাহারা নূতন ভাব উদ্ভাবন করিতে পারে না, এবং নূতন ভাবের সম্ভাবনা দেখিতে পায় না। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতির সহস্র পন্থা আছে। আজ পর্য্যন্ত শক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ ভাঙ্গিল না। আজ পর্য্যন্ত পাঁচ ছয়টী ব্যতীত দল হইল না। যদি এক শত দল হইত তবে বুঝিতাম ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ ভাঙ্গিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর পরে আবার কি ঋষি ভাব দেখিতে পাইব না? আবার কি শত শত ভক্ত দল একত্র হইয়া ভক্তি সাধন করিবে না? আবার কি শাস্ত্রকারেরা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে সত্য সকল সংগ্রহ করিবে না? আবার কি কর্ম্মীদল প্রাণপণে পারিবারিক সামাজিক প্রভৃতি কর্ত্তব্য সকল সাধন করিয়া

সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইবেন না? আমরা কি দেখিব না যে আর এক স্থানে বৈরাগিদল ধন মান সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, গালে হাত দিয়া হাসিতেছেন "আমি আর আমি রহিলাম না, আমি ব্রহ্ম-হস্তগত হইয়াছি।" এ সকল সম্প্রদায় আমরা দেখিব। সাধকদল এরূপ বিভাগে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক। আবার সেই একটি একটি দলের ভিতর হইতে সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম আবিষ্কৃত হইবে। আবার এমন কতকগুলি লোক বাহির হইবে যাহারা দুই দলের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। সকলে যোগী বৈরাগী হইবে না, সকলে ভক্ত হইবে না। ব্রাহ্মগণ, সাধনের তত্ত্ব তোমরা এখনও প্রকাশ কর নাই। বিচিত্রতা বিনাশ করিতে চেষ্টা করিও না। যাঁহাদের দক্ষিণ বাহু পরাক্রমশালী তাঁহাদিগকে বাহুবল প্রকাশ করিতে দাও। যাঁহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর তাঁহাদিগকে বিবিধ শাস্ত্র হইতে লাবণ্যময় সত্য সকল সংগ্রহ করিতে দাও। যাঁহারা জন্মিয়াছেন যোগী হইবার জন্য তাঁহাদিগকে যোগী হইতে দাও, যাঁহারা জন্মিয়াছেন ভক্ত হইতে তাঁহাদিগকে হরিনাম করিতে এবং চৈতন্য প্রভৃতি সাধুদিগকে ডাকিতে দাও। তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মুখোজ্জ্বল হইবে। এক রকম হইব কেন? এক পথে চলিব কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা মনুষ্যের স্বভাব বিচিত্র হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্য, তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একতা স্থাপন করিতে চাও? ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধকগণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে সাধন করুন। এই

জন্য ব্রহ্মমন্দির বেদী হইতে এই ভবিষ্যৎ বাণী বলিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে শত সহস্র সাধক দল প্রস্তুত হইবেন। চারি পাঁচটী দল হইলে ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব। এক সূর্য্য সহস্র সহস্র রশ্মি বিস্তার করিতেছে, সেইরূপ একধর্ম্ম সহস্র সহস্র প্রণালীতে মনুষ্য জাতির অভাব সকল দূর করিবে। এক সঙ্গীত শাস্ত্রই কত প্রকার আকার ধারণ করিবে। এক সমুদ্রের জল পাত্রের বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে সাদা, কাল, সবুজ হয়। সেই সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা পৃথিবীতে থাকিতে দিব না যাহার ভিতরে বিদ্বেষ ঘৃণা আছে। বিদ্বেষ, ঘৃণা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। সুতরাং তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব। যে দলভুক্ত হব সেখানে অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা দূরে থাকুক বরং অধিক শ্রদ্ধা করিতে শিখিব। দশ সহস্র ভাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহার পরের পরিধিতে দশ কোটী ভাই বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়া গান করিতে- ছেন; কিন্তু সেই যে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে গান করিতেছিল, শেষে হইল এক সঙ্গীত! এক হইতে উৎপত্তি, একে লীন, কেবল সাধন বিভিন্ন।

বণিক জাতি।

১৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০১ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

মনুষ্য কোন্ জাতি? মনুষ্য বণিক জাতি। মনুষ্যজন্ম বণিক, তাহার পিতা মাতা বণিক, সে বণিক সম্প্রদায় ভুক্ত, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বণিকের কার্য্যই তাহার কার্য্য; বিষয় বুদ্ধিকে ভ্রান্তি বলিলে কি হইবে বিষয় বুদ্ধিই সর্ব্বত্র প্রধান। হিসাব করিয়া লাভ না বুঝিলে কেহ কার্য্য করিতে চায় না। মনুষ্যের ভ্রম আছে মানিলাম; কিন্তু যেরূপ আমাদিগের বুদ্ধি, সংস্কার এবং শিক্ষা তাহাতে আমরা লাভ ক্ষতি এ দুয়ের গণনা করিবই। এই কার্য্য করিলে লাভ হয় এই কার্য্য করিলে ক্ষতি হয় জানিয়া যাহাতে ক্ষতি হয় তাহা করিব না। এই বণিক জগতে লাভের প্রত্যাশায় সকলে কার্য্য করে, ক্ষতিতে ভয় করে। সমুদয় সংসার এই ভাবে চলিতেছে। লাভ ক্ষতি এই দুই স্তম্ভের উপর সকল সংসার বিচরণ করিতেছে। সর্ব্বত্র লাভের প্রত্যাশা ক্ষতির ভয়। আমাদিগের সকলেরই যে বণিক ভাব ইহা সহজে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যেখানে বণিক ভাব এত প্রবল, যেখানে সুচতুর ভাবের এত প্রাধান্য, তখন তাহা কেনই বা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারিবে না? যাহাতে লাভ নিশ্চয় তাহা সকলে করিবে। যে দেশে সকলেরই এ প্রকার সংস্কার সে দেশে

ধর্ম্মই বা কেন সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে না? বাণিজ্য ব্যবসায়ের যখন এত প্রাবল্য, তখন ধর্ম্মকেও বাণিজ্য লইয়া পড়িতে হইবে। সকল কার্য্য ব্যবসায়ীর ভাবে সম্পাদন করিবে, ধর্ম্মেই কেবল অব্যসায় থাকিবে এমন আশা করা যায় না। অনেক মনুষ্য ধর্ম্মের পথে আইসে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে অব্যবসায়ী ধার্ম্মিক একজনও দেখা যায় না। লাভ ক্ষতি গণনা করে না প্রেম ভক্তি সমুদ্রে মগ্ন, এ দৃশ্য অতি বিরল। এ পৃথিবীর সকলেই বণিক, ব্রাহ্মণ একজনও নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে এমন কে আছে যে লাভ ক্ষতির গণনা করে না, অল্প মাত্রও ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত? সকলেই গণনা করে, যে কার্য্যে লাভ সেই কার্য্য করে, যে মন্ত্রে লাভ সেই মন্ত্র গ্রহণ করে, যে গুরুর সহবাসে শুভ হয়, সেই গুরুর অনুগত হয়। মনুষ্যের সংস্কার যেরূপ ধর্ম্মও যখন সেইরূপ নিয়মের অধীন হইল, তখন ধর্ম্মে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহার আশা কি প্রকারে হইবে! যে সকল অঙ্গ সাধনে লাভ তাহাই করিবে।

পৃথিবীতে কেবল একটা বস্তু বণিকের হস্তে পড়িল না, তাহা প্রেম। প্রেমের সঙ্গে বণিক ভাবের চিরবিরোধ। সুচতুর মনুষ্যের সঙ্গে প্রেমের চিরবিবাদ বিসম্বাদ। যেখানে ক্ষতি লাভের বিচার সেখানে প্রেম যায় না। ব্রাহ্মগণের প্রেম এবং পৃথিবীর প্রেমে কোন ভেদ নাই। পৃথিবীর প্রেমে তুমি যদি আলিঙ্গন কর সেও তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। এ

প্রেম ব্যবসায়ী প্রেম, ইহাতে এক দিক হইতে প্রেম না পাইলে, অন্য দিক হইতে প্রেম দেওয়া হয় না। আমরা প্রেম প্রত্যাশা করি। বল দিব, তবে আমি দিব, এই আমাদিগের কথা। এই রীতিকে আমাদিগের মধ্যে প্রেম বলে। তুমি আমার বাটীতে আসিলে আমি তোমার বাটীতে যাইব, তুমি দুঃখের অবস্থায় যদি অন্ন দিয়া থাক আমি তোমাকে অন্ন দান করিব, আমার অশিক্ষিত সন্তান সন্ততিকে তুমি শিক্ষা দাও, আমি তোমার সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দিব। তুমি আমার পরিবারের ভার লইলে আমি তোমার পরিবারের ভার লইব। তুমি আমায় সুখী করিলে আমি তোমায় সুখী করিব; তুমি আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে, আমার মতে চলিলে, আমি তোমার সমাদর করিব। আমায় তুমি গুরু স্বীকার কর, আমি তোমায় গুরু স্বীকার করিব। তুমি আমায় মিত্র বল, আমি তোমায় মিত্র বলিব। তুমি আমায় ভাই ভাই বলিয়া ডাক, আমি তোমায় ভাই ভাই বলিয়া ডাকিব। তুমি আমার চরণে পড়িলে আমি তোমার চরণে পড়িব। সুচতুর ব্যবসায়ীদিগের সম্বন্ধে এ শাস্ত্র আগাগোড়া সমান, কিছুমাত্র বিরুদ্ধ নয়। সকলেরই জীবন পুস্তকে প্রেম শাস্ত্রের বিরোধী মত আছে। প্রত্যেকে এই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে পড়িয়া আছে। সকলে কেবলই প্রত্যাশা করে। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না যত দিন আশা ছিল তত দিন সকলে ভাই বন্ধু ছিল। যাই আশা পূর্ণ হইল না, আশা সমূলে বিনষ্ট হইল,

অমনি সেই আশার সঙ্গে সঙ্গে ভাই বন্ধুগণকে জলাঞ্জলি দিল। যতক্ষণ তুমি আমার ভাল করিবে আমি তোমার কৃতদাস হইয়া থাকিব, যত দিন তুমি আমার করিবে তত দিন আমি তোমার করিব, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। যদি তুমি আমায় ঘৃণা কর আমি তোমায় নিশ্চয় ঘৃণা করিব, তুমি আমায় উপেক্ষা করিলে আমি তোমায় নিশ্চয় উপেক্ষা করিব। পরের নিকটে প্রেম পাইয়া অপ্রেম করে ব্রাহ্মদের এ নীচ প্রবৃত্তি নাই। প্রেম পাইলে প্রেম দেয় ব্রাহ্মদের এটুকু আছে। উপকার পাইলে উপকার করিব, যেখানে দুপয়সা লাভ হয়, সেখানে দুপয়সা দিব, কিন্তু যেখানে দুপয়সা পাওয়া যায় না সেখানে যে দুই পয়সা দিয়াছি তাহা ফিরাইয়া লইব। প্রেমের কথা জিহ্বাগ্রে আসিবামাত্র রূঢ় কথা শুনিলাম, কটু কথা আরম্ভ হইল, প্রেম ফিরাইয়া লইলাম। উপকার করিতে গেলাম, যাই ভাই অস্ত্র ধারণ করিল, তৎক্ষণাৎ উপকার করা বন্ধ করিলাম, আমিও শাণিত অস্ত্র ধারণ করিলাম। তুমি যেমন করিবে আমিও তেমনি করিব। এই ব্রাহ্মদের প্রেম। যদি বড় প্রেম হয়, দুআনা পাইলে চারি আনা প্রেম দিতে পারি। যেরূপ সামগ্রী পাইব, ঠিক তাহার মতন মূল্য দিব। ঋণী হইলে ঋণ পরিশোধ করিব, মূল্য না পাইলে দিব না। এখানে যাহারা আছে তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাওয়া যাইবে, স্নেহের কথা না শুনিলে, ভালবাসা না পাইলে, আমরা কাহাকেও ভালবাসিব না, তুমি আগে

অঙ্গীকার কর আমায় ভালবাসিবে, তবে আমি তোমায় ভাই বলিব। যাহারা ভালবাসে তাহাদিগের নিকট এমনি বশীভূত যে প্রাণের সমুদয় প্রেম তাহাদিগকে দিব। আলিঙ্গন করিলে উপকারী বন্ধুকে আলিঙ্গন করিব। উপকার করিলে যাহার সঙ্গে এক ঘণ্টার পরিচয় তাহাকেও যথাসর্ব্বস্ব দিব। প্রাতঃকালে যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলাম সন্ধ্যাকালে যদি সে কটু বলে, সমুদয় প্রেম তাহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইব। তাহাকে যত প্রেম দিয়াছিলাম তাহার বক্ষঃস্থল ছেদন করিয়া সে সমস্ত ফিরাইয়া লইব। যদি এক সের দিয়া থাকি ঠিক হিসাব করিয়া এক সের বুঝিয়া লইব। যাই ভাই শত্রুতা করিলেন, অমনি তাহার সঙ্গে ভ্রাতৃভাব শত্রুতায় পর্য্যবসান হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই প্রকারে চলিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত এমন একজনও পাওয়া গেল না যে বলিল, আমার সর্ব্বস্ব লইলেও আমি পরিবার নির্ম্মাণ করিব। আমার যাহা কিছু আছে সকলি হরণ করিলেও আমার প্রাণের ভিতরে ষোল আনা প্রেম দিব। যদিও আমাকে বিপন্ন করে ও আমার চিরশত্রু হয়, আমাকে প্রাণে বধ করে, তথাপি আমার প্রেম ঠিক থাকিবে।

আমরা এ শাস্ত্র পাঠ করি নাই। যদি ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে চাই, ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, তবে আমাদিগকে এই প্রকার প্রেমের আধার হইতে হইবে। এ নামের যথার্থ যোগ্য হইলে সকলের প্রেম হইবে, নিঃস্বার্থ প্রেম হৃদয়ে আসিবে। আমরা জন্মে বণিক। আমাদিগের নিকট

সম্পর্কি বিষয়বুদ্ধি এক। আমরা লাভ দেখিলে তবে প্রেম দিতে পারি, লাভ না দেখিলে দূর করিয়া দি। কিন্তু ইহার আর এক দিক আছে। যদি আমরা ব্যবসায়ী হইলাম, তবে প্রকৃত ব্যবসায়ী কেন হই না? যদি বণিকই হইলাম তবে পূর্ণ বণিক হইব। আমাদিগের জাতি বণিক জাতি হউক, আমাদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ নাই, তাই হউক। ধর্ম্মের উচ্চ ভাবের সঙ্গে বাণিজ্য কিরূপে মিলান যায় একবার দেখা যাউক।

ইহলোক অতি সামান্য, ইহার সঙ্গে পরলোক আনয়ন কর, ইহলোক পরলোক দুই একত্র কর। যদি বাণিজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, যে কার্য্যে লাভ তাহারই জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে। ছোট ছবিখানি নামাইয়া ফেলিতে হইবে। অমুককে এত টাকা দিলাম, তাহার জন্য পরিশ্রম করিলাম, তাহার সন্তানগণকে সৎপথে আনিতে যত্ন করিলাম, যখন সে সদয় হইল না, আমিও প্রেমের ব্যবহার ছাড়িলাম। এই ছোট ছবিখানি নামাই। উহার স্থানে বড় ছবিখানি রাখ। বড় ছবিতে দেখিতে পাইবে, দুষ্ট জগৎ সাধককে অগ্নিতে দগ্ধ করিল, সাধক সর্ব্বস্ব জগৎকে অর্পণ করিলেন। যখন তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন, তখন হস্ত দুইখানি উর্দ্ধে তুলিয়া বলিতেছেন "হে পিতঃ! জগদ্বাসী সকলে শত্রুতা করিল তাহাদিগকে প্রেম দিলাম, প্রাণ দিলাম এখন আনন্দের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। হে মহাদেব, তুমি জগদ্বাসীদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।" এই ছবির দিকে দৃষ্টি

করিলে দেখিতে পাই, সাধকের দৃষ্টি আর কোথাও নাই, তাঁহার দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে। তিনি অগ্নির ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত, কিন্তু তাঁহার হাতে প্রেমের অতুল সম্পত্তি, তিনি যে তাহা হইতে আপনিও সম্পত্তি লাভ করিবেন তাহার সাক্ষী ব্রহ্ম। যদি বাণিজ্য করিতে হয় তবে এই ছবি অনুসারে বাণিজ্য করিলে বাণিজ্যের হিসাব পূর্ণ হয়। বাণিজ্যের লাভ ইহলোকে না রাখিয়া স্বর্গে রাখিলে, তাহা হইতে কোটী কোটী সম্পত্তি লাভ হয়, পুণ্য আনন্দ শান্তির স্বর্ণমুকুটে মস্তক শোভিত হয়। বণিক যদি হইতে হইল, তবে এইরূপ বণিকই হওয়া ভাল। দিলাম আমার অতি সামান্য প্রাণ, পাইলাম যে দেব দেবের পদ। আমার এই সামান্য ক্ষুদ্র অনিত্য দেহের শোণিত দিলাম, পাইলাম কিনা অমৃত,—চিরজীবন নিত্য আনন্দ। দিলাম অতি তুচ্ছ, পাইলাম অনেক। এখানে দশ জন আমায় পদাঘাত করিল, দশ বৎসর অত্যাচার করিল, তাহার বিনিময়ে যাহা পাইলাম তাহার দশাংশের একাংশও উহা হইল না। এই শরীরের রক্ত দিয়া যদি অনন্ত জীবন সঞ্চয় করিতে পারি তবে তাহাতে ক্ষতি কি? সকলই লাভ। যখন আমি এইরূপে উৎপীড়িত হইতে লাগিলাম আমার দীক্ষা গুরু হরি হৃদয়ে থাকিয়া বলিলেন তুমি দশ দিন ক্লেশ ভোগ করিতেছ, কিন্তু তোমার জন্য অনন্তলোক ব্রহ্মলোক সঞ্চিত রহিয়াছে। এক বিন্দু প্রেম দিলাম অনন্তপ্রেমসমুদ্র আমাকে পরিবেষ্টন করিল। দশ জন আমায় পদাঘাত করিল, সেই মস্তকের ধূলিবিন্দু স্বর্গে

উজ্জ্বল হীরকখণ্ড হইল। যে মুখ পৃথিবীর লোক সত্যের জন্য কলঙ্কিত করিতে যত্ন করিল, সেই মুখ সমুজ্জ্বল পুণ্যালোকে পরিশোভিত হইল। ধন্য বণিক ব্যবসায়, এই যদি বণিক জাতি হয়, তবে চিরদিন বণিক থাকিব। ব্রাহ্মগণ! এইরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় কর, অনেক লাভ হইবে। প্রেমের ব্যবসায়ে ইহলোকে লাভ নাই, ইহাতে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। দুদিন চারি দিন এক বৎসর দুবৎসরের মধ্যে লাভ করা এরূপ ক্ষুদ্র বণিক ব্যবসায় ছাড়। এখানে যশ মান কীর্ত্তি সম্পত্তি লাভ করিব এরূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিত্যাগ কর, ক্ষুদ্র দোকান বন্ধ করিয়া দাও, যাহা-দিগের নিকট বিন্দু প্রত্যাশা নাই, যাহারা কিছুমাত্র মূল্য দিবে না তাহাদিগের নিকট গিয়া হরিনাম শুনাও, পথে পথে হরিনাম বিতরণ কর। দেখ সামান্য চৈতন্য শিষ্যেরা কেমন লোককে নামামৃত পান করায়। তোমরা লোককে হরিনাম শুনাও। যদি গালি দেয় তবু শুনাও, যদি মারে মার খাইয়াও শুনাও। ব্রাহ্ম হইয়া এইরূপে লোকের হিতসাধন কর, যে তোমাদিগের প্রতি শত্রুতা করে চিরদিন তাহাদিগের মিত্র থাক। কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিও না, লোকে বিমুখ হইলেও বিমুখ হইও না। সত্য প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কাহাকেও সাড়ে পোনের আনা প্রেম দিলে চলিবে না, একেবারে ষোল আনা প্রেম দিতে হইবে। কিছুমাত্র বিনিময়ের আশা করিও না। বিনিময় অতি জঘন্য। বিনিময়

সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। এখানে কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রাখিয়া প্রেম বিতরণ কর, পরলোকে ফল ফলিবে। এখানে কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, প্রাণ দিয়া যাও, আপনার বলিয়া কিছু রাখিও না। কেন পরের মঙ্গল করিব এরূপ চিন্তা করিও না, এরূপ করিলেই অধর্ম্ম হইবে। যে ব্যক্তি পরের জন্য কাঁদেন পরদুঃখে দুঃখী হন স্বর্গ তাঁহারই, পৃথিবীতে তিনিই ধন্য।

ঋণ পরিশোধ।

২২এ বৈশাখ, রবিবার, ১৮০১ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

যে ব্যক্তি ঋণী সে যদি একটি দুইটি টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য দান করে, তাহা হইলে তাহার তত সুখ হয় না। ঋণের অত্যন্ত গুরু ভার যদি মস্তকে থাকে, তবে দুই পাঁচ টাকা শোধ করিলাম ভাবিয়া কিরূপে শান্তি হইবে। সমুদ্রের সমান ঋণ, পাঁচ টাকা দেওয়া আর পাঁচ কোঁটা জল তুলিয়া ফেলা একই। ইহা আলোচনা করিয়া কি মন স্থির হইতে পারে? অনেক দূরের পথ চলিতে হইবে, দুই হাত পথ চলা হইল, ইহা ভাবিয়া কি আর সে পথিকের আনন্দ হয়? ঋণের গুরু ভার মস্তকে রহিয়াছে, বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, ইহাতে

মন কিছুতেই লঘু হয় না, হৃদয় আনন্দ অনুভব করে না, এ কথা সকলেই জানেন। ব্রহ্মের প্রেমের ভারে আমরা সকলেই ঋণী, তাহাতে যদি প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করি, দুই একটি প্রিয় কার্য্য করি, দুইবার চারিবার সত্যতত্ত্ব প্রচার করিতে যত্ন করি, তাহা হইলে কি হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয়, না কিছু করিতে পারিলাম না বলিয়া অনুতাপ উপস্থিত হয়? ঋণ যে কিছু শোধ হইল ইহা তো কিছুতেই মনে হয় না। সামান্য কাজ করিয়া সামান্য কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কিছু হইল, ইহা তো বুঝিতে পারি না।

আর কিছু ধারি না, এ কথা বলিবার উপায় নাই। যে ঋণী সেই ঋণী রহিলাম, কিছু আদায় দিতে পারিলাম না। দশ বৎসর পর যেমন ঋণ তেমনই রহিল। ব্রহ্ম হয় তো কিছুই পাইলেন না। বোধ হয় কিছু দেওয়া হয় নাই, ঋণ সমানই আছে। ঋণ করিয়া কিছু পরিশোধ না করা আমাদের সেই অবস্থা। হাজার উপাসনা করি, উৎসবে যোগ দি, সাধু কার্য্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, জ্ঞান লাভ করি, হাজার পরোপকার করি, অপরের দুঃখ দূর করি, শেষে গণনা করিয়া বুঝি কত অল্প ঋণ শোধ হইল। এই জন্য ভক্তেরা অনুগত হইয়া একেবারে কিছু থোক টাকা আদায় দিতে চেষ্টা করেন। এত বড় ঋণ, একদিন কিছু বিশেষ আদায় দিতে পারিলে সন্ধ্যার সময় ভাবিয়া কিছু সুখ অনুভব করিতে পারেন। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যদি কিছু বিশেষ আদায় দিতে পারি,

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে কোন ভক্ত ভক্তিতে অশ্রুপূর্ণ হন. শেষে সর্ব্বত্যাগী হইয়া পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য উন্মাদ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। লোকে যে প্রচারক হয়, ঈশ্বরের নামগুণকীর্ত্তনে জীবন কাটায় তাহার মূলে এই ভাব নিহিত আছে। কত কাল ঋণ করিতে করিতে শেষে আর ঋণের দায় সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্ত বাহির হইয়া পড়েন। ঋণীর ন্যায় কে দুঃখ ভোগ করে? সেই ভক্ত যদি কিছু আদায় দিতে পারেন এই ভাবিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হন।

কোটী অগণ্য বিধাতার মঙ্গল ভাব। আমাদিগকে তিনি কত প্রকারে সুখী করিলেন। আমাদিগকে অমূল্য ধর্ম্ম দিলেন, পরিবারে সংসারে সুখ সান্ত্বনা দিলেন, বিঘ্ন বিপদ দূর করিলেন, মোহের বন্ধন মোচন করিলেন। এত ঋণ ভারাক্রান্ত যাহারা তাহারা আর সে ভার কত কাল সহ্য করিবে? এই ভাবিয়াই তাহারা পাগলের ন্যায় ঋণ শোধ করিতে বাহির হয়। ঋণে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কি! লক্ষ বৎসরে এক পয়সা পরিশোধ করিব, ইহা ভাবিতেও পারা যায় না। দেখি একবার ঋণ শোধের জন্য চেষ্টা উদ্যোগ প্রকাশ করি। প্রাণের ভিতর যত যত্ন অনুরাগ আছে একত্র করিয়া সাধক ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন প্রদক্ষিণ করিলেন, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঈশ্বর ক্ষমতা না দিলে কিছুই করিতে পারেন না, কিছুতেই ঋণ পরিশোধ হইবে না; ক্ষুদ্র

মন কিছুই করিতে পারিবে না। এক টাকার স্থলে দশ টাকা দিতে পারিলে মনে আনন্দ হইবে এই ভাবিয়া লোকে প্রচারক হয়; পথে পথে হরিনাম করিয়া বেড়ায়, হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কান্দিয়া অস্থির হয়। যিনি সন্তানবৎসল তাঁহার সন্তান সকল হরিনাম বিনা কষ্ট পায় দুঃখ পায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়ে অধীর হয়, ইহা হইবে না। এই বলিয়া পৃথিবীর সুখ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া বাহির হয়; ধার শোধ করিবার জন্য প্রাণ অর্পণ করে। যশ মান ধন সুখ্যাতি লাভের জন্য নহে, কেবল এই জন্য লোকে প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। ঋণের কথা ভাবিলেই কাহার না মনে এরূপ ভাবের সঞ্চার হয়?

হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন যিনি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন যে তিনি ঈশ্বরের নিকটে ঋণী নাই? সংসারে যদি ঋণ থাকে, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য আমরা কত যত্ন করি, কতবার ভাবিয়া আকুল হই। ব্রহ্মের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য কেন তাঁদের প্রাণ আকুল হয় না! এমন আকুলতা প্রচারকের ব্রতে যাহারা ব্রতী তাঁহাদিগের মধ্যেও দেখিতে পাই না। পৃথিবীর জন্য যাহা-দের চক্ষে জল পড়ে না, ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পথে পথে বেড়ায় না, হরিনাম দেয় না, হরিনাম কাহাকেও শুনায় না, আজও যাহাদিগের ঋণ পরিশোধের ভাব হইল না, আজও যাহারা দু পাঁচ শত লোককে ডাকিয়া আনিতে পারিল না,

তাহারা প্রচারব্রত পালন করিবে কি প্রকারে? বল ঋণ পরিশোধ করিতে কাহার মন ব্যাকুল হয়? ব্রাহ্ম, তুমি কি প্রচারকের হস্তে ভার দিয়া নিজে অপবিত্র ভাবে সংসার করিবে? ব্রাহ্ম! তুমিই প্রচারক। তুমি যদি ঋণী নও মনে কর, তোমার প্রেমনয়ন নাই, তুমি অন্ধ। তুমি কি জান না, তুমি যে অন্ন খাও সে অন্ন ধার করা, তোমার যে বাহুবল সে বল ব্রহ্মের বল ধার করা, তোমার যে টাকা পয়সা এ সমুদয় ঋণ করা টাকা পয়সা। ধার করিয়া তুমি অন্ন খাও, ধার করিয়া তুমি দুগ্ধ পান কর, ধার করিয়া তৃষ্ণার জল পান কর, ধার করিয়া বন্ধুতার সুখ সম্ভোগ কর, ধার করা শয্যায় রজনীতে শয়ন কর। ধারে তোমার জীবন আরম্ভ, ধারে তোমার জীবন শেষ। বৎসর তোমার ঋণে আরম্ভ বৎসর তোমার ঋণে শেষ। তুমি ঋণে ঋণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছ। যখন এত ঋণ তখন তোমাদের প্রাণ ব্রহ্মেতে একেবারে সমর্পণ কর, মন্দিরের বেদীর এ কথা বলিবার অধিকার আছে। তোমরা ঋণ পরিশোধের কি উপায় করিলে বলিতে হইবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋণ ভারি হইতেছে পরিশোধের কি উপায় হইল? উপাসনা করিলাম, বই পড়িলাম, নির্জ্জনে হরিনাম সঙ্কল্প করিয়া উচ্চারণ করিলাম, ঋণ পরিশোধ এইটুকু চেষ্টাতে হইতে পারে না। লক্ষ টাকা যেখানে ধার, সেখানে মহাজনকে দু পয়সা পরিশোধ দিয়া কি কোন ব্যক্তি সুখী হইতে পারে? তুমি কি প্রকারে সুখী হইতে চাও, কেবল নাম করিয়া স্মরণ করিয়া শান্তি

হইল তাহাতে কি হইল? তুমি সুখী হইতে পার না, সুখী হওয়া সম্ভব নহে। চিন্তা কর না তাই সুখী। তুমি ধারে বিক্রয় হইয়া গেলে, ঋণে ডুবিয়া গেলে উহার পরিশোধের উপায় কর। প্রচারব্রতে যোগ দাও। নর নারী সকলকে বলিতেছি, তোমরা ব্রহ্মের শরণাপন্ন হও। নারীগণ তোমরা যে সকল অলঙ্কার পাইয়াছ, পুরুষগণ তোমরা যে সকল গুণ পাইয়াছ তাহা এই জন্য যে সমুদয় সঞ্চিত ধন ব্রহ্মের পাদপদ্মে দিয়া সুখী হইবে। দুখানি অলঙ্কার দু পাঁচটী টাকা যাহা দিতে পার দাও, ইহাতে এ বলিয়াও তো সুখী হইতে পারিবে অন্ততঃ দুটী টাকা পরিশোধ দিয়াছি। ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিলে আপনাকে সুখী জ্ঞান করিবে। অতএব ব্রাহ্ম! উৎসাহ অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হও উত্থান কর, ঋণের কষ্ট আর যাহাতে না থাকে তজ্জন্য যত্নশীল হও।

এমন সময় আসিতেছে যে সময় পুরুষ কেন সকল নারী না হয় অত্যল্পসংখ্যক নারীও প্রচারের জন্য ব্যাকুল হইবে। এক অংশ যখন জীবন উৎসর্গ করিল, তখন অন্য অংশ কেন জীবন উৎসর্গ করিবে না? চারিদিক দগ্ধ হইল। এই ঘোর কলিকালে ঘরে ঘরে কত পাপ কত অধর্ম্ম। ঈশ্বর! তোমার অন্ন খাইয়া চুপ করিয়া নিদ্রা যাই, আর এরূপ থাকিতে পারি না। উৎসাহী হইয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারি এরূপ ক্ষমতা দাও। এমন ভক্তি সঞ্চয় করিতে যত্ন করি যাহাতে নিয়ত অশ্রুপাত হয়, ব্যাকুলতা হয়, প্রেম সম্ভোগ হয়। কিছু-

দিন এরূপ না করিলে কিছুতেই অন্ন খাইতে পারি না। অলঙ্কার পরিধান তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত পাপ। অন্ন পান বস্ত্র অলঙ্কার আমাদের কিছুতেই অধিকার নাই। এ সকল আমরা কিসের জন্য পাই? শুদ্ধ নিজের কল্যাণের জন্য না কোটী কোটী লোকের কল্যাণের জন্য। আমরা প্রেমে কত খাইলাম পরিলাম, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কি কিছু দিতে পারিলাম? দু একটি গান করিয়া তুষ্ট হইলে কি হইবে? সমুদয় দিনের মধ্যে একটু উপাসনা করিলেই বা কি হয়? এত দিন গেল কৈ নামে মত্ত হইতে পারিলাম? কৈ সমুদয় প্রাণ প্রেমে প্লাবিত হইল? কৈ সকলকে তো সরল ভালবাসা দিতে পারিলাম না? আমাদের কি সামান্য কি, আমরা সাবধান হইয়া একটু একটু ধর্ম্ম সাধন করি। পাছে ক্ষতি হয় এই ভয়ে আমরা অগ্রসর হইতে চাই না। এই কি আমাদের ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভাব? যাঁহার প্রেমে প্রতি দিন প্রতিপালিত হইতেছি, যিনি এমন সুন্দর সুন্দর সত্য দিলেন, যাঁহার করুণায় আমাদিগের কত সৌভাগ্য, সেই ঈশ্বরকে কিছু দিতে পারি না। তিনি অসীম উপকার করিয়া আমাদিগকে ভয়ানক ঋণ-জালে আবদ্ধ করিতেছেন। এত সত্যরত্ন দিলেন, এত ভাল ভাল বন্ধুতে পরিবেষ্টিত করিলেন, এত সাধুসঙ্গ এত সকল সৌভাগ্য দিলেন, এমন কি আপনি দর্শন পর্য্যন্ত দিলেন, এখন কি বলিব, "হে হরি! আর দেখা দিও না, ধন দিও না, দয়াতে অভিষিক্ত করিও না।" তিনি বলেন, "দেখিবে আরো কি করি।"

এত ধন রত্ন দিয়াছি আরো কত দেব। তাঁহার কৃপায় হস্ত পদ বদ্ধ, মন অবাক্, হৃদয় আর্দ্র হয়। তিনি এত করিলেন, অথচ পৃথিবী মরিতেছে দেখিয়া তাহার দুঃখ মোচন করিব না? পৃথিবী যে আমাদিগকে অধাৰ্ম্মিক সম্প্রদায় বলিবে। আমরা কি ধৰ্ম্মপ্রচারের জন্য সামান্য চেষ্টাও করিব না? আমরা এই ভাবেই অবস্থান করিব?

তোমরা দেরি করিতেছ, ইহাতে তোমাদের ঋণ বাড়িতেছে, শীঘ্র ঋণ যে ভারবহ হইবে। ঈশ্বরের নিকট সরল অন্তঃকরণে আপনার অবস্থা জানাইয়া ঋণ পরিশোধের উপায় কর। নতুবা কি বিপদ ঘটিবে আজ জান না, যে দিন চক্ষে চক্ষে মিলন হইবে, সে দিন ঘরে থাকিতে পারিবে না, উন্মাদ হইয়া বাহির হইতে হইবে। সমুদয় ধন পরিশোধ করিতে গিয়া বুকের রক্ত দিতে হইবে, জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইবে। যদি হয় নাই হইবে, পাপীর শুভদিন আইসে নাই, আসিবে। এমন দিন আসিবে না মনে করিও না। কত উৎসব সম্ভোগ করিলাম, কত সত্য শিখিলাম কত তাঁহার প্রেমলীলা দেখিলাম, প্রাণমন্দিরে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া কত সুখশান্তি পাইলাম, বন্ধু বান্ধব কত আনন্দ দিলেন, এ সকল হিসাব পুস্তকে জমা হইতেছে, ঠিক দিলে কত ঋণ জমা হইয়া পড়িবে। এ সকল পরিশোধ করিবার জন্য এক দিন আকুল হইতে হইবে, অস্থির হইয়া কাঁদিতে হইবে, বুকের রক্ত দিতে হইবে। ঋণদায় বড় দায়, পৃথিবীর টাকা

ধার করিয়া কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। প্রেমের ঋণ মানুষকে একেবারে অস্থির করিয়া দেয়, কিছুতেই পরিশোধ হয় না। হাজার যত্ন করিয়াও, কিছু হইল না কিছু হইতে পারে না, এই বলিয়া কেবল রোদন করিতে হইবে। এ ঋণ পরিশোধ বুকের রক্ত না দিলে হয় না, উন্মাদ না হইলে হয় না। প্রেমের ঋণ আদায় দিতে হইবে যে দিন মনে হয় সে দিন আর লোক ঘরে থাকিতে পারে না। মানুষ প্রচারক হয় কি জন্য, ভক্ত যোগী হয় কি জন্য, সর্ব্বত্যাগী হয় কি জন্য, প্রেমের ঋণে ব্রহ্মের ঋণে বাধ্য হইয়া সর্ব্বস্ব দেয়। তোমার আমার সকলকেই সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। নরনারী সকলকে নতন ভাবে প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। মূঢেরাই প্রচারক নাম এক স্থানে আবদ্ধ রাখে। প্রচারক আর কিছু নহে, দেশ বিদেশে সময় ও ক্ষমতানুসারে কেবল ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ, ধর্ম্ম ও অমৃত বিতরণ। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি হয়। ঋণ পরিশোধের সেই কথা ভাবিয়া আমরা নিশ্চয়ই সুখলাভ করিব। যাহার যে গুণ আছে ভাবুন, কত ঋণ আছে মনে করিয়া দেখুন, আর ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন তাহা করুন।

ঈশ্বরের ঋণদান।

রবিবার, ১৯এ অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে দুষ্ট মহাজনের যে রীতি, ভাল মহাজনেরও সেই রীতি। দুষ্ট মহাজন ক্রমাগত তোমাকে ঋণ দিবে, তুমি সেই ধন অপব্যয় কর কি নষ্ট কর তাহা দেখিবে না। বারম্বার ঋণ দিবে, আবার ঋণ চাও, আবার ঋণ দিবে, সুদ দিতে না পার তথাপি কিছু বলিবে না; কিন্তু এমন সময় আসিবে যখন তোমাকে বিপন্ন করিয়া অবশেষে কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় রহিল না, তুমি অবসন্ন. এবং নিরাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলে; কিন্তু তোমার দুষ্ট মহাজন তাহার উপরে আবার তোমাকে কারাগারের দুর্বিসহ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। কি চমৎকার ব্যাপার!! প্রধান মহাজন যিনি তাঁহারও প্রায় এই প্রকার রীতি, প্রভেদ এই যে তিনি ভাল মহাজন, তিনি সাধু অভিপ্রায়ে ক্রমাগত ধনরাশি ঋণ দেন এবং এইরূপে প্রলোভনে ফেলিয়া আমাদিগকে অবশেষে তাঁহার সুখের কারাগারে বদ্ধ করেন। তাঁহার বিপুল সম্পত্তি, সমস্ত বিশ্ব তাঁহার সাম্রাজ্য, তাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য কত কেহ পরিমাণ করিতে পারে না, প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত, আর আমরা পৃথিবীর এক কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র দরিদ্র

বাস করিতেছি। আমাদের সহস্র প্রকার অভাব। অন্ন, বস্ত্র, জল, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিনা আমরা বাঁচিতে পারি না। এই সমুদয় অভাবে কাতর হইয়া আমরা বেড়াইতেছি। মহাজনের ঘরে প্রচুর সামগ্রী আছে। ক্ষুধার সময় অন্ন চাও সেখানে রাশি রাশি অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল চাও, তাঁহার রাজ্যে অসীম জলরাশি। ঐ দেখ কত সমুদ্র, কত নদী, কত প্রস্রবণ, কত তড়াগ সরোবর। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন 'তোমরা সকলকে জল দাও'। রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া শীতল সমীরণ আকাঙ্ক্ষা করিলে, ঈশ্বরের আজ্ঞাতে দক্ষিণ দিকের সহস্র দ্বার উন্মুক্ত হইল। রোগের সময় ঔষধের প্রয়োজন হইল, পর্ব্বত সকল এবং পৃথিবীর নানা স্থান রাশি রাশি ঔষধ প্রদান করিতে লাগিল। সত্য জ্ঞান লাভ করিয়া পৃথিবীর অন্ধতা দূর করা আবশ্যক হইল, ঈশ্বর রাশি রাশি পুস্তক সহ অগণ্য জ্ঞানী শাস্ত্রীদিগকে প্রেরণ করিলেন. কত জ্ঞান তোমরা নিবে? জ্ঞানের যে অন্ত নাই, কত গুরু, কত সাধু দৃষ্টান্ত, কত সারি সারি সত্য, কত সদুপদেশ, কত উৎসাহ, যত চাও দর্শন শ্রবণ করিয়া লও। পাপে কাতর হইয়া ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছ, ইহা দেখিয়া ঈশ্বর কত ধর্ম্ম-প্রচারক কত সাধু কত ভক্ত প্রেরণ করিলেন। বুঝিলে ও মহাজনের কত ধন! মহাজনের ধনের অন্ত নাই। কিন্তু কত ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কি বুঝিতেছ? তাঁহার খাইলে, তাঁহার বস্ত্র পরিলে, তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিলে,

ওহে ঋণী [illegible], ওহে ঋণী ভ্রাতঃ! কত ঋণ বাড়িতেছে তাহা কি [illegible]ঝিতেছ? চার দিনে চতুর্গুণ হইল, পঞ্চাশ বৎসর [illegible]চলে কত ঋণ বাড়িবে! ধর্ম্মের ঋণ কত অধিক এক মুখে বলিতে পারি না। যাহারা "সত্যং শিবং সুন্দরং" কে একবার দেখিয়াছে, দুইবার দেখিয়াছে পাঁচ শত বার দেখিয়াছে, তাহাদের মস্তকের উপরে কি ভয়ানক প্রেমের ঋণ!! তাহাদের ঋণ ভাবিলে চক্ষে জল আসে। মহাপাপী বলিল, আমি এখনই উপাসনা করি, স্বর্গের দ্বার খোলা, মহাজনের ধন বর্ষিত হইল। সংসারে আসিয়া দেখিল তাহার সুকুমার সন্তান জন্মিয়াছে, ওদিকে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া প্রেমে তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে! পাপীর এত সুখ!! মনের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং বর্ত্তমান। অনেক ধন মহাজন দিতেছেন, তুমি যে পরিশোধ করিতে পারিবে না তিনি কি জানেন না? তাঁহার ঋণ হইতে উমুক্ত হইতে পারিবে না, ইহা অন্তর্য্যামী নিশ্চয়ই জানেন। স্বর্গের জননী প্রত্যহ কত নূতন নূতন স্বর্গের ব্যাপার দেখাইতেছেন, মাতার করুণা কেমন করিয়া পরিশোধ করিবে? মূল ধনই দিতে পারিব না, সুদ দিব কিরূপে? এ ঋণ পরিশোধ করিবার নহে। ইহার ফল এই হইবে যে অবশেষে প্রেমের কারাগারে বদ্ধ হইতে হইবে। জগজ্জননী আমাদিগকে এত প্রেমে কেন ভাসাইতেছেন? তিনি বড় সুচতুর মহাজন, তিনি প্রেমঋণ দিয়া অবশেষে আমাদিগকে কারা-

গারে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন। ঈশ্বরের প্রেম স্বর্ণশৃঙ্খল। তাঁহার প্রেমরজ্জু আমরা ছেদন করিতে পারিব না। তিনি প্রেম দ্বারা এই কয়টি লোককে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন। যখন দেখিবেন ঋণ পরিশোধ করিবার আর আমাদের আশা ভরসা নাই, তখন স্পষ্টরূপে বলিবেন বৎস, এখন যাও ঐ শ্রীঘরে চিরকাল, অনন্ত কালের জন্য বদ্ধ হইয়া বাস কর। দুষ্ট মহাজনের ব্যবহার দেখিলে দুঃখ হয়; কিন্তু সাধু মহাজনের রীতি দেখিলে মন নির্ভয় হয়। তবে ঈশ্বরের প্রেমের ঋণ বৃদ্ধি হউক। আমরা ঋণী হইয়া চিরকাল তাঁহার শ্রীচরণে থাকিব ঈশ্বর আমাদের এই আশা পূর্ণ করুন।

ভক্তির লক্ষণ।

রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

জল না স্থল? ভক্ত উত্তর দিলেন জল। যথার্থ ভক্তি-ভাব জলের ন্যায়, স্থলের ন্যায় নহে। ভক্তিশাস্ত্র জলের শাস্ত্র। ভক্ত স্থল স্পর্শ করেন না। কঠিন ভূমিকে উপমার স্থলে পরিত্যাগ করেন এবং জল গ্রহণ করেন। ভক্তির জন্ম জলেতে, ভক্তির ভ্রমণ জলেতে। ভক্তির স্বর্গ জলেতে। ব্যাকুলতার জলে ভক্তির জন্ম। কোথায় ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর বলিতে বলিতে চক্ষুর প্রথম জলবিন্দুতে ভক্তির জন্ম।

কেবল সেই চক্ষে ভক্তি হইয়াছে যে চক্ষে জল হইয়াছে, যে চক্ষে জল আসিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে কত জ্ঞান চর্চ্চা ছিল, কিন্তু ভক্তি আসে নাই। যাই চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল বাহির হইল, তখনই ভক্তি আসিলেন। জল বাহির না হইলে ভক্তি আসিবে না এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ভক্তির পিপাসা হয়, ভক্তির ক্ষুধা হয়। এই ক্ষুধা পিপাসা উভয়ের শান্তি হয় সুধাপানে। ভক্তি কঠিন খাদ্য চান না। ভক্তির ক্ষুধা পিপাসা হইল, আর সেই স্বর্গের জল সুধার আকার ধরিয়া তাঁহার মুখে আসিল। প্রাতঃকালে ভক্তি বলেন, সুধা দাও, দ্বিপ্রহর দিবাতে ভক্তি বলেন সুধা দাও, রজনীতে ভক্তি বলেন সুধা দাও। এইরূপে ভক্তি সর্ব্বদাই সুধা প্রার্থনা করেন। একটি তাঁর পরিপুষ্টির কারণ সুধা পান। ভক্তি ঈশ্বরের প্রেম সরোবরে অবগাহন করেন। ভক্তি মরুভূমিতে বসিয়া থাকেন না, সুতরাং ইহার জন্য ঈশ্বর প্রকাণ্ড সরোবর সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তি সেই জলে ডুব দেন, যতই তাহার মধ্যে অবগাহন করেন ততই পরিতুষ্ট হন। ভক্তি যখন অবগাহন করেন, প্রথমে জল অল্প। সেখান হইতে উঠিয়া সংসারে আসেন, আবার পৃথিবীর উত্তাপ লাগে, আবার জলে পড়েন, আবার উঠিয়া সংসারে আসেন, কিন্তু শেষে এমন অবস্থা হয় যে সংসারে আসিবামাত্র রৌদ্রের উত্তাপ এত দূর অসহ্য হয় যে আর সেখানে নিমেষের জন্যও থাকিতে ইচ্ছা হয় না, কেবলই

সেই জলে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় এবং উপরের গরম জল ছাড়িয়া ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর জলে নামিতে বাসনা হয়। যতই ভক্তি বৃদ্ধি হয় ততই সেই মধুর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা হয়। আবার সেই সমুদ্র ছাড়িয়া সংসারে আসিতে হয়, আবার শীঘ্রই সংসার ছাড়িয়া সেই সমুদ্রে মগ্ন হইতে হয়। এইরূপে বার বার সংসারে আসা এবং বার বার শান্তিসমুদ্রে ডুবা ভক্তির জীবনের কার্য্য; কিন্তু ক্রমে সংসারের দিকে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। প্রথমাবস্থায় ভক্তি সাগরের উপরিভাগে সাঁতার দেন, আবার যখন ফিরিয়া যান বুঝিতে পারেন এত দূর আসিলাম। উপরিভাগে যাঁহারা সাঁতার দেন তাঁহারা নিকৃষ্ট ভক্তসম্প্রদায়। জলতত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন, যাঁহাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে, ভক্তিসাগরেও বুদ্ধি তাঁহাদের নেতা হইয়া কার্য্য করিতেছে। ভক্ত যখন ডুব সাঁতারের অবস্থা পান, তখন তিনি বুঝিতে পারেন না যে কোথায় আছেন। যতই নিম্নদিকে যান ততই আর দিগ্‌বিদিক্ বোধ থাকে না। পূর্ব্ব পশ্চিম জানেন না। তিনি ঘুরিতেছেন আর ডুবিতেছেন, জলমগ্ন হইয়া সাঁতার দিতেছেন। তাঁহার ভক্তি তাঁহাকে এত ডুবাইয়া দিতে লাগিল, তাঁহার ভক্তির ভাব এত অধিক হইল, যে আর ইচ্ছা হইলেও তিনি ফিরিয়া আসিতে পারেন না। ফিরিবার ইচ্ছা হইলেও যে দিকে যান আরও গভীরতর স্থানে গিয়া পড়েন, এবং আরও আনন্দ-

সাগরে মগ্ন হন। স্থলের সংস্পর্শ নাই। স্থলে বেড়ায় যাহারা তাহারা জ্ঞানী, ভক্ত স্থলচর হইতে চেষ্টা করেন না। তিনি শুষ্ক মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া জলের ভিতর জলচর হইয়া জল লইয়া আমোদ করেন। তিনি তাহাকেই ডুবিয়া যাওয়া বলেন যেখানে দিক্ জ্ঞান থাকে না। অতএব ব্রাহ্ম! যখনই শুষ্কতা, কিম্বা বিষাদ অনুভব করিবে তখনই ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে ডুব দিবে। তখন কি দেখিবে? কেবল প্রেমজল, পুণ্যজল, আনন্দজল। অধিবাস করিতে লাগিলে প্রেমজল এবং আনন্দজলের মধ্যে। ব্রাহ্ম, তুমি যত শ্রেষ্ঠ হও না কেন, যদি বল আমি এদিক ওদিক চিনি তবে তুমি প্রমত্ত হও নাই। ভক্ত কেবল ডুবিয়া যান। স্থলে টান থাকে না; জলেতেই স্রোত, জলেতেই টান। যদি বাঁচিতে চাও জলের ভিতর আপনাকে ছাড়িয়া দাও, এমন এক আবর্তের ভিতরে লইয়া যাইবে আর উঠিতে পারিবে না, ক্রমাগত স্বর্গের দিকে চলিতে থাকিবে। গভীর সাগরে পতিত হইলে জ্ঞান বুদ্ধি থাকিবে না। তিনি হতচৈতন্য পাগলের ন্যায় হইয়া পড়েন। তিনি বুদ্ধি সহকারে কিছু করিতে পারেন না। পশ্চিমে যাইব মনে করেন পূর্ব্বে যান। তিনি ঈশ্বরের হইয়াছেন। তবে আর কেন আপনার ইচ্ছা রাখ। অল্প ভক্ত হইলে ঐ সংসার দেখিতে পাইবে। যদি গভীর ভক্তি চাও তবে কেবলই ডুবিয়া থাক, ডুবিয়া সুধা খাও। ডুবিয়া ঈশ্বরের প্রেমে আরও মগ্ন হও।

চিরবন্ধুতা।

রবিবার, ২৬এ ভাদ্র, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

বন্ধুর নিকট কোন বন্ধু বিদায় লইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন এই দেখা হইল, আবার দেখা কবে হইবে? প্রেমিকহৃদয় এই কথা স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে। মিলন হইলেই বিচ্ছেদ হয়, বিচ্ছেদ হইলেই প্রেমিকহৃদয় জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে মিলন হইবে? আবার এইরূপে সুখে বসিয়া সদালাপ করিব কবে? যাহার বিশ্বাস এবং প্রেম অল্প সে নিরুত্তর থাকিবে; কিন্তু প্রেমিক বলিবে নিশ্চয়ই আবার দেখা হইবে। স্বর্গধাম যেখানে ভক্তগণ বাস করেন, এখানে নহে ওখানে। সেখানে নিশ্চয়ই পুনর্মিলন হইবে। বিশ্বাসী প্রেমিক বলেন আমার বন্ধুকে আমি দেখিবই দেখিব। এই উদাহরণ ইতিহাস মধ্যে পাওয়া কঠিন, ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়; কিন্তু দৈনিক জীবনে দেখা যায় না। কোন্ বন্ধু এই কথা বলিতে পারেন যে বিদেশে যাওয়া হইলে কিম্বা পরলোকে গেলে প্রণয় ছিন্ন ভিন্ন হইবে না? ব্রাহ্মসমাজ প্রণয়ের সমাজ, ধর্ম্মবন্ধুতার সমাজ, নতুবা ব্রাহ্মসমাজ কিছুই নহে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কোন্ দুই জন পরস্পরকে এই আশ্বাস দিতে পার যে বিচ্ছেদ হইলে আবার পরলোকে পুনর্মিলন হইবে? পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী

করিয়া কেহ বলিতে পারে না, যেমন তুমি আছ চন্দ্র! যেমন তুমি সূর্য্য আছ! ইহা সত্য, তেমনি আমরা দুই জন পরলোকে মিলিত হইব ইহা সত্য। এ কথা কে বলিতে পারে? সকলেই এই কথা বলে যত বার একত্র হইতে পার এই পৃথিবীতে হও। সোমবার, মঙ্গলবার, যত পার সপ্তাহের সমস্ত বার একত্র হও, কেন না শমন প্রকাণ্ড অস্ত্র লইয়া তোমার প্রণয় ছেদন করিতে আসিতেছে। কিন্তু যতবারই দেখা হউক না কেন তাহাতে কি মনের সাধ মিটে? যদি ব্রাহ্মবন্ধু হইয়া, ঈশ্বরের দাস হইয়া এক ফোঁটা অমৃত পান করি, তবে শত সহস্র ফোঁটা পান করিতে লালসা হয়। প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখিয়া এক বিন্দু আনন্দ পাইলে সিন্ধুপ্রায় আনন্দ পাইতে ইচ্ছা হয়। সেইরূপ বন্ধুকে কাছে লইয়া যদি এক ঘণ্টা নাম সুধা পান করি, তাহা হইলে দুই ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে সেই সুধা পান করিতে ইচ্ছা হইবে, সময় আরও বৃদ্ধি হউক, সেই সুখ চিরস্থায়ী হউক, যত কাল জীবিত থাকিব এইরূপ মিষ্ট বন্ধুতা চির-দিন ভোগ করিতে লালসা হইবে। যেখানে প্রকৃত বন্ধুতা হয় না সেখানে শীঘ্রই ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, এবং শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু যথার্থ বন্ধুতার গল্প শেষ হয় না। তোমার সঙ্গে কি কখনও হরিনাম করিয়াছি? তোমার সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে যদি চক্ষুর এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে তবে তোমার এবং

আমার মধ্যে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ঈশ্বর যাহাদিগকে একত্র করেন মৃত্যুও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। যদি একবার শুভ মিলন হইল এবং মৃত্যুও যদি তাহা বিনাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুতা চিরস্থায়ী হইল। মৃত্যু ঘটনায় আমাদের বন্ধুতা এই পৃথিবীতে শেষ হইবে; কিন্তু চিরকালের জন্য শেষ হইবে না। আরও দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত পরলোকে সম্মিলিত হইব। সাধুসমাজ মস্তক নাড়িয়া বলিতেছে এখানে বন্ধুতার শেষ হয় না। এই যে দেবলোক, যেখানে বসিয়া উপাসনা করিতেছে। এই মন্দিরে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যতক্ষণ তাহার নাম রসে মগ্ন থাক ততক্ষণ স্বর্গে স্থিতি বর। এই দেবলোকে ধর্ম্মবন্ধুও উপভোগ করিতে পারা যায়। তবে বিচ্ছেদের ভয় কেন? বাস্তবিক মন যদি লালায়িত হয়, যদি তুমি এবং আমি ঈশ্বরে হৃদয় মধ্যে গিয়া বসি তবে তিনি যে রজ্জুতে আমাদিগকে বাঁধিবেন, কাহার সাধ্য তাহা ছেদন করে? ঈশ্বর তো নড়িবেন না, সুতরাং আমরাও নড়িব না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিবে আমি তোমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিব। এখানে বিশ্বাস প্রেম এত দূর প্রবল যে সাধকেরা নিশ্চিন্তরূপে বলিতে পারেন, অমুক অমুক পরলোকে একত্র হইবে, নিশ্চিত হইবে। নতুবা এখানকার সমাজ এখানে রহিল। যেমন সংসারের ধন ছাড়িব, তেমনি কি বন্ধুগণ! তোমাদিগকে ছাড়িব? তাহা হইলে সংসারের

সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ এক হইবে। পরলোকে কিছুই গেল না। তোমাদের প্রণয় যদি যথার্থ হয় তবে হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের ভয় নাই, পরলোকে অশরীরী হইয়াও ঈশ্বরের নাম লইয়া পরস্পরে মিলিয়া উচ্চতর, পবিত্রতর সুখে সুখী হইবে।

অশ্রুজলের মাহাত্ম্য।

রবিবার, ৩০এ শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

সংসার করিতে গেলে অনেক জলের প্রয়োজন, ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলেও অনেক জলের প্রয়োজন। কূপ, সরোবর, নদী, সাগর, মহাসাগর, অকাশ হইতে বারি বর্ষণ এ সকলই সংসারের পক্ষে অতি উপকারী। জল বিনা সংসার চলে না, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও হৃদয় শুষ্ক হইলে আর আশা থাকে না। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় সত্যপূর্ণ রাশি রাশি শাস্ত্র পাইলে আমাদের কি হইবে, যদি ইহার সঙ্গে সঙ্গে জলের আয়োজন না থাকে? হৃদয়ে যদি প্রেমজল না থাকে এ সকল থাকিবে না। তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য শরীরের মলা প্রক্ষালন করিবার জন্য, যেমন জল চাই, সেইরূপ ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবার জন্যও অনেক জল চাই। এই যে চক্ষু দেখিতেছ ইহার মধ্যে

জল থাকে। ইহা ব্যতীত অন্তরের মধ্যেও জল থাকে, কিন্তু সে সকল নিরাকার জল। আজ এই চক্ষের জলের বিষয় বলা হইতেছে। যাহারা অশ্রুবিদ্বেষী অবিশ্বাসী অপ্রেমিক তাহারাই বলে এক ফোঁটা জল ফেলিলেই কি লোকে স্বর্গে চলিয়া যায়? এতই কি অশ্রুর ক্ষমতা? তাহাদের নিকট চক্ষু অতি সামান্য যন্ত্র, ইহার কোন মর্য্যাদা নাই। কিন্তু বাস্তবিক আকাশ হইতে বারি বর্ষণ না হইলে যেমন শস্যাদি জন্মে না এবং সংসার চলে না, সেইরূপ চক্ষু হইতে বারি বর্ষণ না হইলে ধর্ম্মজীবন হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন প্রেমের বাহ্যিক লক্ষণ সকল সর্ব্বদা প্রকাশ করা আবশ্যক নহে। কিন্তু ভক্তির প্রকাশ মনুষ্যের হস্তে নাই "উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে" হৃদয়ে যদি নদ নদী উচ্ছ্বসিত হয় কাহার সাধ্য চক্ষুকে শুষ্ক রাখে? ইহা ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা। শোক উথলিয়া উঠিলে মানুষ কাঁদে। যাহার যত অধিক ভাব হইবে সেই ভাব তত অধিক পরিমাণে জলরূপে পরিণত হইবে। একটি সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলেই ভাব অশ্রুরূপে পরিণত হয়। এই সীমার মধ্যে থাকিলে অশ্রুজল দেখা যায় না। একটি অবস্থা আছে যখন অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম আসিয়াছে বটে, কিন্তু এত দূর আসে নাই যে উচ্ছ্বাস হইবে। আধার যদি বড় থাকে, আর জল যদি অল্প হয়, উচ্ছ্বাস হয় না, চক্ষু একটি পথ বই নহে। ভাবের ঘনতা ভিন্ন অশ্রুপাত হয়

না। ঘোর বিপদের সময় যখন ঈশ্বরের বিশেষ করুণা দেখিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, তখন চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। ক্রমে ক্রমে ভাব ঘনীভূত না হইলে তাহা হইতে বারি বর্ষণ হয় না। আকাশে যেমন ক্রমে বাষ্প জমা হয়, এবং অনেকক্ষণ পর মেঘ হয়। এবং সেই মেঘ আবার ঘনীভূত না হইলে বৃষ্টি হয় না, হৃদয়াকাশেও ঠিক সেইরূপ। আমারই বা অশ্রুপাত হয় না কেন? তোমারই বা অশ্রুপাত হয় কেন? এক মিনিট ভাবিতে না ভাবিতেই তোমার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়ে, আর আমি ছয় মাস ধরিয়া ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেছি, কত সুমধুর সঙ্গীত শুনিলাম, কতবার বুঝিলাম যেন আমিও ঈশ্বরকে ভালবাসিতেছি, তথাপি আমার চক্ষু দুটি রুক্ষ রহিল কেন? আমার কেন তেমন ঘন প্রেমভাব হইল না যাহাতে বৃষ্টি হয়। তোমার কেমন সৌভাগ্য যে ঈশ্বরের চরণ ভাবিবামাত্র তোমার অশ্রুপাত হয়। তুমি একটি গাছের নবীন পত্র দেখিলেই কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হও, আর আমি পাঁচ সহস্র গাছ এ দেশে ও দেশে দেখিলাম অথচ আমার চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল না। তুমি একটি পাখীর গান শুনিয়া বিহ্বল হইয়া গেলে, তোমার বিষয়কার্য্য কোথায় পড়িয়া রহিল, দুই ঘণ্টা কাঁদিতে লাগিলে, আর বলিতে আরম্ভ করিলে হায় পাখী, আবার গান কর। তবে কি তোমার চক্ষু এক পদার্থে নির্মিত এবং আমার চক্ষু অন্য পদার্থে নির্মিত? না তাহা নহে। একই হস্ত একই

পদার্থে উভয়ের চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়াছে, তবে যে এক চক্ষে শীঘ্রই জল পড়ে, এবং আর এক চক্ষু রুক্ষ থাকে তাহার কারণ আছে। আমরা প্রেমকে ঘনীভূত হইতে দিই না। স্থির হইয়া যদি ব্রহ্মের পানে তাকাই এবং তাঁহার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রেম ঘনীভূত হইয়া আসিবে। ইহাতে মানুষের হাত নাই। মানুষ চক্ষের জল ধারণ করিতে পারে না। হে অশ্রুবিদ্বেষী। যদি বল চক্ষুতে এক ফোঁটা জল আসিল না আসিল কি হইল? আমার সাধন এবং যোগবল আছে, এই অহঙ্কার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করে। আমরা ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ক্রন্দন করিয়াছি, এবং যত দিন জীবন তত দিন ক্রন্দন করিব, তবে কি না উন্নত জীবন লাভ করিলে উন্নত ভাবে ক্রন্দন করিব। পৃথিবীতে আসিয়াছি কেবল কাঁদিবার জন্য। দয়াল ঠাকুর বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিব, পরে প্রেমসুন্দর ঈশ্বর যখন দেখা দিবেন আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিব। দুজনে বিরলে বসিয়া কাঁদিব এই জন্য ধ্যান করি। একটি নাম রসনাতে লইলাম, আর চক্ষের জল পড়িল, কেন তাহা জানি না। স্মরণ দ্বারা ঈশ্বরের পুরাতন ঘটনা সকল ডাকিয়া আনিলে অশ্রুপাত হয় বটে; কিন্তু তাহাতে তেমনি তৃপ্তি নাই। প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিলে যেমন নয়নবারি পতিত হয়, তাহাতে হৃদয় শীতল হয়। ইহা সাধনের প্রথমবস্থায় চলে। হে ভ্রাতঃ! আমি শুনিলাম তুমি এখন নানাবিধ

উচ্চতর ব্রত পালনে মনোযোগী হইয়াছ; কিন্তু “প্রাণনাথ” এই চারিটি অক্ষর সুমধুর হইয়াছে কি না? এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে যদি ভক্তিরসে বিহ্বল না হও তবে তুমি ব্রাহ্মসমাজে মুখ দেখাইবার উপযুক্ত নহ। কেবল যে কাঁদিব আমরা এমন নহে তুমি এ কথা বলিতে পার। আমিও তোমাকে প্রতিদিন ক্রন্দন করিতে বলিতেছি না। আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঈশ্বরের মুখ দেখিবামাত্র প্রগল্‌ভা ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় কি না? আগে যে মুখ দেখিতে এখনও সেই মুখ দেখিলে প্রেম ঘনতর হয় কি না? ঈশ্বর-দর্শনমাত্র অনেক ভক্তিজল বাহিরে আসিয়া আবার ফিরিয়া বাড়ী যায়; কিন্তু যত অশ্রু চাপিয়া রাখ না কেন, সেই অতুল প্রেমানন দেখিলেই ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিবে। ঈশ্বর-দর্শনে প্রেমজল উথলিয়া উঠে আবার সেই স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নানা প্রকার অশ্রুজল আছে। অশ্রুতত্ত্বশাস্ত্র অতি প্রকাণ্ড। আমি কেবল এই বলিতেছি, চক্ষের জল ফেলা সামান্য মনে করিও না। কি রকম করিয়া কাঁদিলে সমস্ত জীবন ভাল যায় তাহা শিক্ষা কর। যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বলিব হে ঈশ্বর! এস একবার কাঁদি, তখন আর কি জ্ঞান বুদ্ধি থাকিবে? ঐ কে যে কাছে আসিয়া বসিয়াছেন! ইহা বলিতে বলিতে কথা জড়াইয়া যাইবে। তোমার স্তব স্তুতি কেবল চক্ষের জল ফেলা, ইহার এত শোভা যে ইহাতে আপনাপনি মোহিত

হইবে। আপনাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, যত দিন তুমি পৃথিবীতে থাকিবে এইরূপে কাঁদিবে। পিতার চরণ বক্ষে ধরিয়া কাঁদিলে যত আহ্লাদ হয় এমন আহ্লাদ আর নাই।

প্রকৃত প্রার্থনা।

রবিবার, ২৩এ শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

ঈশ্বরকে টানিয়া বিচারে আন, তোমরাই হারিয়া যাইবে। ব্রাহ্মগণ! ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তোমরা অভিযোগ কি কর নাই? করিয়াছ। এই অভিযোগ যে, ডাকিলে তিনি শুনেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শরীরকে অস্থিচর্ম্ম সার করিলাম, মনকে মৃতপ্রায় করিলাম, তথাপি প্রভুর অনুগ্রহ পাইলাম না। যদি তিনি ভবেরকাণ্ডারী দয়ালু হইতেন তবে কি তাঁহার দয়া হইত না? নিরাশ্রয় পাপী বলিতে পারে, আমি ক্রমাগত দশ বৎসর এত যে কাঁদিলাম তথাপি যে তাঁহার দয়া হইল না ইহাতে তাঁহার দয়াতে কি দোষ আসিতেছে না? এইরূপ নানা প্রকার কাগজ পত্র লইয়া পাপী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করে। অমুক নগরে অমুক ব্রাহ্ম অনেক অনুতাপ করিল, অনেক কাঁদিল, অমুক গাছের তলায়, অমুক সাধক এত কঠোর সাধন এবং জপ তপ করিল তথাপি প্রভুর

দ। হইল না। এ সকল কথা বাস্তবিক প্রেমময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ইহাতে এই বুঝায় যেন যথা সময়ে পাপীদিগের প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ হয় না কিন্তু বিবেককর্ণ যদি থাকে, ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এত কাল সৃষ্টি হওয়া অবধি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এরূপ নালিশ বারম্বার হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম কি নিরুত্তর? এ সমুদয় যুক্তি দ্বারা কি এই স্থির করিব যে ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি আমাদের কথা শুনেন না এবং কথা কন না? একটু ভাবিলে বুঝা যায়, সেই প্রেমময় শান্ত মূর্ত্তি এই কথা বলিয়া আমাদের অভিযোগের উত্তর দিতেছেন। সেই কথাটি কি? "তোমরা সহস্র বার ডাক" এই কথার গূঢ় অর্থ আছে। তাঁহাকে যদি আমরা একবার ডাকিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমাদের এই দুঃখ থাকিত না। আমরা অনেকবার ডাকি এই জন্য তিনি যে আমাদের কথা শুনেন তাহা বুঝিতে পারি না। হে পিতা! হে পিতা! বলিয়া বার বার ডাকিলাম উত্তর না পাইয়া মনে করি যেন তিনি শুনিতে পান নাই। মনুষ্যের স্বভাব এরূপ কার্য্য করে। মানুষ বিচার করিয়া এরূপ করে না। দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি, হে ঈশ্বর! এই পাপ যেন আমি ছাড়িতে পারি। যদি দেখি দশটি বৎসর চলিয়া গেল অথচ সেই পাপ যায় না, তাহা আমার হাড় পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, তখন কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিব ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। প্রতিদিন এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম,

হে দুঃখবিমোচন! এই দুঃখটি টানিয়া বাহির কর, নতুবা বাঁচিব না। আবার বলিলাম, ঈশ্বর! আমার এই বিশেষ পাপটি দূর কর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম হয় তো দশ বৎসর এইরূপে কাঁদিয়াছেন তথাপি একটি পাপও যায় নাই। ইহা দেখিয়া কি মনে করিব? ব্রাহ্মগণ! ইহাতে ঈশ্বরের উত্তর কি তাহা অবগত হইতে চেষ্টা কর। তিনি বলিতেছেন, "তুমি এতবার ডাকিলে কেন একবার ডাকিলেই তো পাইতে?" এই অভিযোগ, সুতরাং এই অভিযোগে আমাদেরই কুটিলতা এবং চতুরতা ব্যক্ত হইল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইল। একবার ডাকিলেই ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজনিয়ম এই তিনি আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন, "পাপী আমাকে একবার ডাকিতে না ডাকিতেই আমি আসিয়া দেখা দিব" কিন্তু হে ব্রাহ্ম! তুমি যদি আবার পাপ করিবে এইরূপ মনে করিয়া কপট ভাবে তাঁহাকে ডাক তোমার কথা ঈশ্বর শুনিবেন কেন? অতএব ঈশ্বরেরই প্রেমের জয় হইল। তিনি বলেন, "একবার কাঁদ দেখি এখনই দেখিবে কেমন আমি দেখা না দিয়া থাকিতে পারি? কিন্তু তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া বারম্বার কাঁদ, পাপ ছাড়িবে না অথচ হে ঈশ্বর! আমার পাপ দূর কর! হে ঈশ্বর, আমার পাপ দূর কর এই বলিয়া তাঁহাকে ডাক এবং ডাকিয়া তাঁহার উত্তর শুনিতে না পাও তবে তোমার দোষ না ঈশ্বরের দোষ? সরল শিশুর ন্যায় সেই বিশ্বাসী একবার ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিল আর তিনি

তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। অস্ফুট ভাষায় সে বলিল, মা! আমার রাগটি দমন কর। আর তাহার রাগ রহিল না, সে প্রেমিক হইল। আর তুমি আমি কি করি? বারম্বার বলি, হে ঈশ্বর! আমি বড় অহঙ্কারী, হে ঈশ্বর! আমি বড় অহঙ্কারী, হে ঈশ্বর! আমি অসুরের ন্যায় দুর্দ্দান্ত আমাকে উদ্ধার কর। আজ বারম্বার এই সকল কথা বলিলাম, ঠিক এ সকল কথা কালকে বলিব, দশ বৎসর পরেও আমাদের মুখে এ সব কথা শুনিবে। যাহারা এরূপ কপটভাবে ঈশ্বরকে বারম্বার ডাকে, লক্ষবার ডাকিলেও তাহারা ঈশ্বরের উত্তর শুনিতে পায় না। কিন্তু ঐ ছোট ছেলে ঈশ্বরের সিংহাসনতলে আসিয়া বলিল, পিতঃ! আমার অহঙ্কার চূর্ণ কর আর সহিতে পারি না। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর তাহাকে কোলে লইলেন তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল সে বিনয়ী হইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিল। এইরূপ এক একটি পাপ সম্পর্কে এক একবার ঈশ্বরকে ডাকিতে হয়। তোমরা একটি দোষ সম্পর্কে যে বার বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর তাহা যাইবে না, তোমাদের প্রার্থনা আকাশ গ্রাস করিবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরকে বলিয়াছিলে আজ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াও যদি সেই পুরাতন কথা বল, দেখিবে তোমার প্রতি ব্রহ্ম বিমুখ, তিনি যেন তোমার কথা শুনিতেছেন না। প্রার্থনা করে কে? যে চায়। ভাই! তুমি কি চাও? এই যে দশ বৎসর ক্রমাগত ডাকিতেছ, তোমার

মুখের পানে তাকাইলে ঈশ্বর কি সরল প্রার্থনার চিহ্ন দেখিতে পান? যে চায় সেই সরল হৃদয় পুত্রের কাছে ঈশ্বর দাঁড়াইলেন, আর যখনই সে প্রার্থনা করিল তখনই তাহার হাত ভরিয়া ধন দিলেন। না ডাকিতে ডাকিতে সে তাঁহাকে পাইল। তাঁহার সেই ছোট ছেলেটি আমাদের দুই জনকে লজ্জা দিয়া ঈশ্বরের হাত হইতে ধন লইয়া চলিয়া গেল। কোন্ প্রাণে আমরা তাঁহাকে বলিব, সেই যে তিন শত বার আমার রাগ দমন কর, রাগ দমন কর এই বলিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিলাম, যখন তুমি আমাদের সেই সকল প্রার্থনার উত্তর দিলে না তখন কিরূপে বলিব যে আমাদের প্রতি তোমার দয়া আছে এবং তুমি আমাদের কথা শুন? ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, যদি আমরা কোন মনুষ্যকে বলি ভাই! তোমাকে বলিতেছি আমি আর যাহাতে পাড়ার লোকের প্রতি উপদ্রব অত্যাচার না করি আমাকে এমন উপদেশ দেও। সেখান হইতে আসিয়া আবার যদি সেইরূপ উপদ্রব অত্যাচার করি এবং আবার দ্বিতীয় দিন তাঁহার নিকটে সেইরূপ উপদেশ শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করি, তিনি হয় তো সেই দিন ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু পুনর্ব্বার সেইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া তৃতীয় দিন তাঁহার নিকটে গেলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার দ্বার বন্ধ করিবেন এবং তাঁহার দ্বারবানকে বলিয়া দিবেন এই কপট ধূর্ত্তকে এখানে আসিতে দিও না। তবে স্থির হইল প্রথম প্রার্থনাটি ঈশ্বরের কাছে

যায়, তার পর কপটতার উপর কপটতা মূলক যে সকল প্রার্থনা, তাহা তুমি আপনিই শ্রবণ কর ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করেন না। কপট দুশ্চরিত্রের প্রার্থনা এইরূপ হয়। নতুবা পিতা পুত্রের দুঃখের কথা শুনিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন? তোমরা কতবার সঙ্গীত দ্বারা বলিয়াছ, একবার ডাকিলেই তিনি দেখা দেন। যদি জীবনে ইহা বিশ্বাস না কর তবে সঙ্গীত পুস্তক হইতে সেই গানগুলি বিদায় করিয়া দেও। যদি এক বিষয়ের জন্য এক সহস্র বার প্রার্থনা করিয়া থাক, সেগুলি নিশ্চয় জানিও ঈশ্বরের কাছে যায় নাই। তবে কি নিরাশ হইবে? না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমাদের অভি-যোগে ঈশ্বরেরই প্রেমের জয় হইয়াছে। একটি বার ডাকিলে তাঁহাকে পাইবে। একবার কাতর প্রাণে ঈশ্বরকে বলিলেই যদি দেখি যে, যে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বলিলাম তাহা গেল, তবে জানিব সেটি যথার্থ প্রার্থনা। আর গুলি কল্পনা। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, মানুষ যেন এক একটি পাপের জন্য এক একটি প্রার্থনা করিয়া সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ধ্যান এবং প্রেম।

৯ই মাঘ, রবিবার, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

চারিদিকে এত ধ্যান, এত যোগের প্রাদুর্ভাব কেন? ভারতবর্ষে আবার কি এই সভ্যতার মধ্যে যোগের আবশ্যকতা?

প'চাদ্দিকে গমন কেন? এই ধ্যানের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনেকে, উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইল আশঙ্কা করিতে পারেন। ক্রমে প্রত্যেক সাধক ঈশ্বরেতে নিবিষ্ট হইয়া অন্যের সংবাদ লইবেন না। ব্রাহ্মেরা যদি গভীর ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন পরস্পরের সঙ্গে যোগ থাকিবে না। ভারতবর্ষে সামাজিক প্রণয় আবশ্যক। ভারতবর্ষ হইতে বিবাদের বীজ উ লন করিতে হইবে। যাহাতে জাতিভেদ না থাকে অর্থাৎ সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায় এক প্রাণ এবং অভিন্ন হৃদয় হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা আবশ্যক। ধ্যান দ্বারা আপাততঃ মনে হয় যে দুইটি লোক একত্র ছিল তাহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র এবং পরস্পরের প্রতি বিমুখ হইল। একজনের মুখ এক দিকে, আর একজনের মুখ অন্য দিকে। ধ্যান দ্বারা নর নারীর মধ্যে যোগ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যাহারা একত্র ছিল তাহারাও স্বতন্ত্র হইল। এই কথার প্রতিবাদ করিবার সময় আসিয়াছে। দেখ একটি বৃক্ষ পত্রের সংখ্যা নাই; কিন্তু সেই সকল পত্র, শাখা প্রশাখা ছাড়িয়া মূলের দিকে দৃষ্টি কর সেখানে স্বতন্ত্রতা নাই। বৃক্ষপত্রে বৃক্ষশাখায় স্বতন্ত্রতা আছে; কিন্তু বৃক্ষমূলে স্বতন্ত্রতা নাই। যাঁহারা বৃক্ষতত্ত্ব পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বলুন। স্বাতন্ত্র্য বৃক্ষের চারিদিকে, কিন্তু মূলে একতা। বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছে, একটি পাতা অন্য পত্রের সমান নহে; কিন্তু প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষপত্র বৃক্ষের

সেই এক মূল হইতে আপনার প্রাণ এবং জীবনের রস টানিয়া লইতেছে; এক মূল হইতে সেই রস সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বৃক্ষ, তুমি আমাদের অনুকরণীয় হও। যত ধ্যান করা যায় কাহার দিকে গমন করি? মূলের দিকে। ইহা মানিলাম, ধ্যানের সময় আপাততঃ ভাই বন্ধুকে ছাড়িয়া যাই। মন্দিরে দুই চারি শত ভ্রাতা একত্র হইয়াছি; কিন্তু ধ্যানের সময় মনে করিতে হইবে যেন কাছে কেহই নাই, যেন একাকী বসিয়া আছি। ধ্যানের অবস্থায় গভীর জনতার মধ্যেও এই নির্জ্জনতা উপলব্ধি করিতে হইবে। তখন কেহ কাঁহার নহে ইহা প্রতীতি করিতে হইবে। গণনা হইতে স্ত্রী পুত্র, বিশেষতঃ ধর্ম্মপথের সহায়দিগকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধ্যানের সময় ধন মান স্ত্রী পুত্র অবশেষে ব্রাহ্ম-বন্ধুও চলিয়া গেল। আপনার শরীরও গেল। কেবল আত্মা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিল। ধ্যানের সময় আর কাহাকেও দর্শন করিতে স্পৃহা থাকে না। তখন ঈশ্বরের সত্ত্বা ভিন্ন আর যত সত্ত্বা সমুদয় বিলুপ্ত হয়। কিন্তু বন্ধুগণ, জিজ্ঞাসা করি কেবল ধ্যান কি পৃথিবীর শেষ অবস্থা? তাহা নহে। ধ্যানের সময় আপাততঃ শাখা হইতে মূলে গমন করি। মূলে সকলেই এক। ধ্যানপথে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। না বন্ধু, না শত্রু, না যুবা, না বৃদ্ধ কাহাকেও দেখা যায় না। একাকী চলিয়া যাইতে হয়। একাকী এক দিন, দুই দিন, এক মাস, দুই মাস, ক্রমাগত যাও;

কিন্তু ভ্রাতঃ, ইহা নিশ্চয় জানিও যেখানে তুমি যাইতেছ আমিও সেখানে যাইতেছি। ক্রমাগত শাখা ভুলিয়া গিয়া মূলের দিকে যাইতেছি। যেখানে পোষণের শক্তি সেখানে যখন গেলাম তখন সকলেই একীভুত এবং মূলীভুত হইলাম। স্বতন্ত্রতা, বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদয়ের মূলীভূত আদি কারণ ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকিব ততক্ষণ পরস্পরের মধ্যে একতা এবং অভিন্নতা থাকিবে। আর যতক্ষণ শাখা ধরিয়া থাকিব ততক্ষণ অসদ্ভাব অপ্রণয় যাইবে না। অনেকে বলিতে পারেন সদ্ভাব দ্বারা অপ্রণয় যায় এবং ধ্যান দ্বারা কেবল স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধি হয়, কেন না ধ্যানের সময় কাহারও সঙ্গে পথে দেখা যায় না। আমি এই কথার প্রতিবাদ করি। আমি বলি মূলেতে যদি মিলন না হয় শাখায় শাখায় কথন মিলন হইতে পারে না। তোমার নিশ্বাস যেখান হইতে আসিতেছে আমার নিশ্বাসও সেই স্থান হইতে আসিতেছে; যেখানে তোমার জীবনের মূল, সেই স্থান হইতে আমার জীবনও প্রবাহিত হইতেছে। উভয়ের উৎপত্তি স্থানে সেই সাধারণ ভূমিতে গমন করিলে নিশ্চয়ই মিলন হইবে; সেখানে পরস্পরকে ভাই বলিয়া ডাকিতেই হইবে। সেই স্থান ছাড় সমুদয় স্থান আমাদের পক্ষে বিদেশ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থান। যদি পরস্পরের মধ্যে যোগ স্থাপন করিতে চাও তবে মূল দেশে চল। সেখানে যাইবার সময় যদি পরস্পরের সঙ্গে এক মাস কি দশ মাস দেখা না হয় ক্ষতি নাই।

কেন না যখন সকলে গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইব তখন নিশ্চয়ই পরস্পরকে চিনিতে পারিব এবং পরস্পরের মধ্যে যোগ হইবে। ধ্যানের সময় পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইলে যে আমরা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র হইলাম ইহা সত্য কথা নহে। এক স্থানে যদি সকলে যায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রণয় সঞ্চারিত হইবে। যথার্থ ধ্যান, প্রকৃত উপাসনা, অকৃত্রিম সাধন ভজন, এই সমুদয় কদাপি বিভিন্ন-তার কারণ নয়। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়া যোগ সাধন কর, আর এক জনের ইচ্ছা হয় তিনি পর্ব্বতের গহ্বরে, প্রস্রবণের তীরে ভক্তি সাধন করুন, আর একজনের যদি ইচ্ছা হয় তিনি ঘরে বসিয়া ধ্যান করুন, এবং অন্য একজনের ইচ্ছা হয় তিনি বন্ধু বান্ধবদিগকে সঙ্গে হইয়া ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করুন; কিন্তু এ সকল সাধন এবং স্থানের ভিন্নতা কখন হৃদয়ের স্বতন্ত্রতার কারণ নহে।

একজন ঋষি হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে বসিয়া যোগ সাধন করিতেছেন, আর একজন য়্যাটল্যাণ্টিক্ মহাসাগর পারে দুঃখী পাপী জগৎকে ঈশ্বরের প্রেমতত্ত্ব শিখাইতেছেন, একজন বৈরাগী হইয়া বৃক্ষতলায় ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন, আর একজন সহাস্য বদনে সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মসহবাস ভোগ করিতেছেন। এই চারিটি আত্মার বাহিক আকৃতি বিভিন্ন, কিন্তু ইহারা একটি বিন্দুতে একীভূত। সেই বিন্দু ব্রহ্ম। এই চারি জনের রেখা সেই বিন্দুতে একত্র হইয়াছে। ব্রহ্মের নিকটে দেশের এবং

কালের দ্বৈত ভাব হইতে পারে না। অতএব যে প্রকার প্রণালীতে হউক, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মযোগ অভ্যাস করুন, এখানে যদি মিলন না হয় পরলোকে মিলন হইবে। এইখানেই বা হইবে না কেন? কোটি মস্তক যেখানে প্রণত হয় সেইখানে মস্তক রাখিলে মিলন হইবেই হইবে। অতএব সকলেই সেই স্থানে যাহাতে পরস্পরের মধ্যে যোগ হয় সেই জন্য চেষ্টা করুন, বাহিরের সামাজিক প্রণয় অপ্রয়োজন। যদি বল অত্যন্ত গভীর ধ্যান হইলেই কি প্রণয় হইবে? আমি বলি হাঁ। আমরা ধ্যান দ্বারা ক্রমাগত যত ঈশ্বরের নিকটে যাইব ততই আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে যোগ গভীরতর হইবে। অতএব ধ্যানকে জনসমাজের বিরোধী বোধ করিবে না, ইহা দ্বারা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি হইবে তাহা নয়, কিন্তু ধ্যান দ্বারা অনন্তকালের স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা পৃথিবীতে পরস্পরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে পারিলাম না, ধ্যানরূপ পাতালে গিয়া সেই যোগ স্থাপন করিব। সেই ব্রহ্মরূপ পাতাল মধ্যে গিয়া একীভূত হইব। যদি যথার্থ প্রেমপরিবার স্থাপন করিতে চাও গভীর ধ্যানে মগ্ন হও, সেখানেই দুই জনের মিলন। ঈশ্বর সেই স্থানে আমাদিগকে মিলিত করুন!

প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর, কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মতত্ত্ব! এত দিন মনে করিয়াছিলাম ধ্যানপথে গেলে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবে না;

কিন্তু তোমার প্রসাদে এখন দেখিতেছি যত মূল দেশে তোমার সহিত মিলিত হইব ততই ভাই ভগিনীদিগের সহিত মিলন হইবে। সকলের সঙ্গে সাধন করিয়া আগে যেটুকু সুখ শান্তি পাইতাম সেইটুকু পর্য্যন্ত তুমি কাড়িয়া লইলে। কোলাহলের মধ্যে থাকিলে কোন্ দিন কোন্ প্রলোভন আসে, কে গলায় ছুরি দেয় তাহার স্থিরতা নাই, তাই তুমি আমাদিগকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইতেছ। নানা প্রকারে জ্বালাতন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর ধ্যান আরম্ভ করিয়া দিলাম। গভীর ধ্যান যোগের পথ অবলম্বন করিয়া মনে করিলাম আর কাহারও সঙ্গে দেখা হইবে না, আর বুঝি পৃথিবীর অভিমুখে ফিরিব না; কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া তোমার সাধকদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিতেছ। দয়াসিন্ধু, তোমার কৃপাতে বুঝিলাম তোমার ভিতরে আবার সকলকে পাইব। মনুষ্য জাতির সকল শাখা এক হইবে। যত পরিবার ঐখানে গিয়া এক পরিবার হইবে। হে প্রিয়তম ঈশ্বর, সকল মানুষ একটি মানুষ হইবে। এখন জানিলাম তোমার শ্রীচরণ লইয়া যে থাকে তাহার সর্ব্বস্ব লাভ হয়। আর সে শত্রুদিগের কাছে যাইবে না। গভীর ধ্যানের ভিতরে নিশ্চয়ই মিলন হইবে পিতা, বাহ্যিক আয়োজন করিয়া মিলিত হইতে চাহি না। প্রেম বৃক্ষতলে ভক্তিনদীর তটে যোগ সাধন করিব, যোগ করিতে করিতে প্রেমেতে সকলের সঙ্গে মিলিত হইব

পরমাত্মন, দেখিব কোটি কোটি নিরাকার আত্মা কেমন আনন্দের সহিত তোমার চরণতলে বসিয়া সুধাপান করিতেছেন। হে দয়াসিন্ধু, সকলকে যোগপথে টানিয়া লইয়া যাও, সেই স্থানে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

মনুষ্যের চতুর্ব্বিধ প্রকৃতি।

২৩এ মাঘ, রবিবার, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

জড়েতে কেবল জড়, পশুতে জড় এবং পশু, মনুষ্যেতে জড় এবং পশু এই দুই বাস করে। মনুষ্যের পিতামহ জড়, পিতা পশু। মনুষ্য স্বভাবে জড় এবং পশু প্রকৃতি দুইই আছে। জড়, পশু এবং মনুষ্য এই ত্রিবিধ পদার্থ সংযোগে যে জীব নির্ম্মিত হয় তাহার নাম মনুষ্য। আমরা যতই ধর্ম্মপথে উন্নত হই না কেন, আমরা দেখিব দুই শত্রু আমাদের মধ্যে আছে—এক জড় এবং এক পশু। কোথায় যে এই গুপ্ত শত্রু আছে জানি না। জড়ের স্বভাব এই যে তাহাকে না নাড়াইলে সে নড়িবে না, সে আপনার জড়স্বভাব কিছুতেই ছাড়ে না। সকলের মূলে সেই জড় বসিয়া আছে। মনুষ্যের যত উৎসাহ হউক না কেন, ক্ষণকাল পরেই সেই উৎসাহ শিথিল হইয়া যায় এবং উল্লিখিত জড়স্বভাব আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমাগত না চালাইলে জড়ের কল

চলে না, একজন চৈতন্যবিশিষ্ট কেহ না চালাইলে আর ইহাতে কিছুমাত্র উদ্যম থাকিবে না। জড়ের প্রকৃতি এই যে ইহা নিশ্চেষ্টতা অথবা স্থিরতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

এই জড়ের সঙ্গে আবার মনুষ্যের জীবনে পশু প্রকৃতি রহিয়াছে। এই পশু প্রকৃতির বশীভূত হইয়া মনুষ্য ইচ্ছা করে আমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকিব, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হইলে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইবে না। ইহা পশুস্বভাব। এই পশু প্রকৃতি মনুষ্যের ভিতরে, এই জন্তু যখন অন্তরের এবং বাহিরের সমুদয় ধর্ম্ম এবং নীতির শৃঙ্খল ছেদন করে তখন কি আর তাহাকে দমন করা যায়? যেমন জড় সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম এবং নিস্পন্দ করিতে চেষ্টা করে তেমনি পশু বিবেকের কথা শুনিবে না, এই পশু প্রকৃতি মনুষ্যকে ঈশ্বর এবং পরলোকের চিন্তা হইতে দূর করিয়া কেবলই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে কুমন্ত্রণা দিতেছে। মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যে দেব প্রকৃতি এবং দেবালয় আছে বটে; কিন্তু ঐ দেবালয়ের নিম্নে এই যে পশু প্রকৃতি আছে ইহা সর্ব্বদাই তপস্যার বাধা বিঘ্ন জন্মাইতেছে। আত্মার অভ্যন্তরে পুণ্যধাম, ঈশ্বরের বাসস্থান, প্রেমনিকেতন, শান্তির আলয়, কুশলের গৃহ প্রস্তুত হইতেছে সত্য, কিন্তু পশু প্রকৃতি সর্ব্বদাই উহার প্রতিবন্ধক হইতেছে। এই প্রকার মিশ্রিত পদার্থে প্রত্যেক মনুষ্য গঠিত হইয়াছে। এই জন্য ধর্ম্মের ভিতরেও পশু প্রকৃতি। অন্তরের মন্দ ভাব কুটিল ভাব

আপনাকে আপনি প্রকাশ করিবেই। অনেক দিনের সাধন দ্বারা স্থিরভাবে একটি দেব প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু বহুকাল পরে একটি পশুভাব আসিয়া সেই দেব প্রকৃতিকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিল। এই জড় এবং পশু আমা-দিগের রক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। এই দুইটিকে না তাড়াইলে আর আমাদের রক্ষা নাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতে হইবে, জড়ের দিকে যাইব না, পশুভাবের দিকে যাইব না, যখনই জড় কি পশুভাব টানিতেছে বুঝিতে পারিব তৎক্ষণাৎ জাগ্রৎ হইয়া উঠিব। আমি কি প্রস্তর খণ্ড যে আমি জড়ের মত বসিয়া থাকিব? নিস্তেজ হইবার দিকে একবারও শরীর আত্মাকে যাইতে দিব না। যে দিকে ভৌতিক পদার্থ, সেই দিকে আত্মা শরীরকে যাইতে দিব না।

যতক্ষণ অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি ততক্ষণ জীবন; যখন সেই তেজ ফুরাইল তখন পশু হওয়া দূরে থাকুক তুমি জড় হইলে। শরীরকে স্পর্শ দ্বারা বুঝিবে, তোমার জীবন প্রস্তরের মত জড় হইতেছে। তোমার রক্ত জড় ভাব ধারণ করিতেছে। সাধুমণ্ডলী উন্মত্ত হইয়া চারিদিকে নৃত্য করিতেছেন; কিন্তু তুমি জড়ের ভাব পাইয়াছ। এই জন্য প্রথমাবস্থাতেই যখন দেখিবে রক্ত বিন্দু বিন্দু শীতল হইয়া আসিতেছে, জীবন নিরুৎসাহ হইতেছে, তৎক্ষণাৎ সেই জড়তাকে তাড়াইয়া দিবে। বাহুবলে জড়তা রোগকে তাড়াইয়া দিবে। যতক্ষণ অন্তরে এক বিন্দু জড় ভাব থাকিবে, ততক্ষণ মনে করিবে

যেন প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড মস্তকের উপরে রহিয়াছে, যদি জড়তাকে যথা সময়ে দূর করিতে না পার, তবে ধর্ম্মজীবন হারাইবে।

এই এক মৃত্যু। আর এক মৃত্যু,—কাম ক্রোধ প্রভৃতি যদি প্রবল হইয়া উঠে। সমুদয় রিপুর মূল কোথায়? পশুভাবের মধ্যে। যদি বল চক্ষু, কর্ণ, রসনা ইত্যাদি ইহারা তো শত্রু নহে; সুন্দর বস্তু দেখিলামই বা, ভাল ভাল গান শুনিলামই বা, মিষ্ট বস্তু ভোগ করিলামই বা, নির্দ্দোষ আমোদ করিব ইহাতে ক্ষতি কি? তুমি নির্দ্দোষ আমোদ বলিতে পার, কিন্তু সেই আমোদের মধ্যে আপাততঃ পাপ হউক আর না হউক, পাপের বীজ রহিয়াছে। সেই আমোদ অল্পে অল্পে হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইয়া উঠিবে। নির্দ্দোষ সুখের নাম লইয়া পাঁচ দিন পরে তাহা তোমার নরকের গতির কারণ হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে কেবল একটুকু আসক্তি, কিন্তু পরে তাহা ভয়ানক পাপের বেশ ধারণ করে। অতএব চক্ষু, কর্ণ থাকে থাকুক, ইহাদিগকে দুষ্ট অশ্বের ন্যায় শাসন করিবে। শরীরটা কিছুই নহে, মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবে। শরীরকে দমন করিয়া আত্মাকে স্ফূর্ত্তি দাও, আত্মাকে তেজ দাও। যে ব্যক্তি বলিল, "কি খাইব, কি পরিব" সে মরিল। যে বলিল, কি খাইব, কি পরিব আবার কি?" সেই ব্যক্তি বাঁচিল। শরীরকে বিরাম দিবার জন্য যিনি ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন না তিনি মরেন। বিরাম ঈশ্বরেতে, আমোদ ঈশ্বরেতে। শরীরকে বিশুদ্ধ আমোদ দিতে

হইবে ইহাও মানিব না। জড় এবং পশুভাবকে সম্পূর্ণরূপে দমন না করিলে আমরা বাঁচিব না।

শরীর নাই বলিলে এই বুঝায়, জড় এবং পশু এই দুই শত্রু নাই। একবার বিশ্বাসের হুঙ্কারে এই দুই দস্যুকে চূর্ণ করিতে হইবে। চক্ষুকে মারিলাম, কর্ণকে মারিলাম, রসনাকে মারিলাম, সমস্ত শরীরকে মারিলাম, জড় এবং পশু দূর হইয়া গেল; রহিল কি? আত্মা। শরীরের জড়তা এবং পশুভাব আমাদের ভয়ানক রোগ। নিরাকার সাধন, অশরীরী আত্মার মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা, এই দুই রোগ দূর করিবার একমাত্র ঔষধ। বিশ্বাসের তূরী দ্বারা শরীরকে উড়াইয়া দাও। শরীর নাই, এমন অবস্থায় যে কার্য্য করিতে হয় সেইরূপ কার্য্য কর। শরীর যেন নাই, এই ভাবে আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব। আমরা নিরাকার আত্মার সেবা করিব। শরীরের সঙ্গে ক্রীড়া করা আর অগ্নির সঙ্গে ক্রীড়া করা সমান। অতএব এই বৎসর শরীরের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, নিরাকার আত্মার সাধন কর। যোগ তপস্যা দ্বারা আত্মাকে সতেজ কর, জড়ের স্বভাব, পশুর স্বভাব চলিয়া যাইবে। অন্তরে বাহিরে কেবল নিরাকার সাধন কর। অন্তরে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে দেখ। ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে করিতে দেখিবে শরীর কোথায় গেল! জড় জড়েতে গেল, পশু পশুতে গেল, এবং অশরীরী আত্মা আস্তে আস্তে স্বর্গধামে উড়িয়া গেল।

স্বর্গে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত।

১৬ই মাঘ, রবিবার, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত যাঁহারা, উচ্চাধিকারী সাধক যাঁহারা তাঁহাদের হস্তে ঈশ্বর স্বর্গধামের চাবি অর্পণ করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় ভক্তকে ডাকিয়া কি বলেন? তোমার হস্তে স্বর্গের চাবি দিলাম। বাস্তবিক স্বর্গের সুধা কিয়ৎ পরিমাণে পান করিয়া কি হইবে? স্বর্গের ভুমি অল্প খণ্ড অধিকার করিয়া কি হইবে? ভক্ত এই চান, ঈশ্বর তাঁহাকে এমন একটি সঙ্কেত বলিয়া দেন যদ্দ্বারা ভক্ত যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর স্বর্গের ভুমি অধিকার করিতে পারেন। যেখানে অধিকার নাই সেখানে অভিলাষ যায় না। যত ক্ষমতা আছে সেই পরিমাণে সম্ভোগ করিব। ক্ষমতানুসারে স্বর্গভোগ করিব সেই বিষয়ে কোন ক্ষোভ না থাকে। অতএব ভক্ত স্বর্গ চান না তিনি স্বর্গভোগ করিবার জন্য ক্ষমতা চান। স্বর্গ চাই বলিলে ভক্ত ইহার কোন অর্থ বুঝেন না। যদি ঈশ্বর প্রকাণ্ড অনন্ত স্বর্গের মধ্যে ভক্তকে ছাড়িয়া দেন, ভক্ত কি ধরিবে, কি ভোগ করিবে? ভক্তের আধার ক্ষুদ্র তদ্দ্বারা ভক্ত কিরূপে অনন্ত স্বর্গ ধারণ করিবে? অতএব ভক্ত এই চান আমার যতদূর পাইবার এবং ভোগ করিবার শক্তি আমি স্বর্গের ততদূর ভুমি যেন লাভ এবং ভোগ করিতে পারি।

তাঁহার জন্ত স্বর্গরাজ্যে রাশি রাশি আহারের আয়োজন, সঙ্কেত না জানিলে কি আহার করিব কি ভোগ করিব কিছুই বুঝিতে পারেন না। যখন ভক্তিরসে মত্ত হইয়া সুধা খাইতে হইবে, কিম্বা যোগে নিমগ্ন হইয়া যোগানন্দ পান করিতে হইবে তখন হয় তো নামোচ্চারণ করা অসম্ভব হইবে। এই জন্য ভক্ত চান তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে একটি সামান্য চাবি থাকিবে, এমন একটি সঙ্কেত হস্তগত থাকিবে, যাহা দ্বারা ভক্তের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা তিনি খুলিয়া লইতে পারিবেন। কখন মনুষ্যের কি আবশ্যক হইবে কে বলিতে পারে? অতএব তাঁহার সঙ্গে একটি চাবি থাকা আবশ্যক যাহা দেখিতে ছোট, কিন্তু যাহার কার্য্য মহৎ, যাহা দ্বারা অনন্ত স্বর্গধাম খোলা যায়, যদ্দ্বারা সমস্ত স্বর্গে বিচরণ করা যায়।

সংসারের মরুভূমিতে শত শত ক্রোশ বিচরণ করিতে করিতে শুষ্ক কণ্ঠ হয়। কোন ব্যক্তির সুধা ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগিল না, পরোপকার ব্রত ভাল লাগিল না, বন্ধুরা যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, তিনি কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না যোগ কি, কিন্তু এই দুরবস্থার সময় যদি তাঁহার হাতে চাবি থাকে তাহা হইলে তিনি প্রাণের সাধে নিজের ক্ষমতা এবং অভাব অনুসারে স্বর্গের ভাণ্ডার খুলিয়া সুধা পান করিতে পারেন। আবার এমন সময় আসিতে পারে যখন তাঁহার সুধা পান করিতে ইচ্ছা হইবে না, যখন তাঁহার কি সাধুসঙ্গ কি নাম কীর্ত্তন কিছুই ভাল লাগিবে না, সেই

সময় হয় তো শাস্ত্র পাঠ করা তাঁহার আবশ্যক। কিন্তু যদিও শাস্ত্রে ঈশ্বরের উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, যতক্ষণ তিনি সেই শাস্ত্রের ঘর যদ্দ্বারা প্রমুক্ত করা যায় সেই চাবি সংলগ্ন করিতে না পারিবেন ততক্ষণ তিনি সেই শাস্ত্রের একটি বর্ণও বুঝিতে পারিবেন না। সমস্ত স্বর্গ তাঁহার নিকটে, কিন্তু চাবি ভিন্ন তিনি স্বর্গের দ্বার খুলিতে পারেন না। অতএব ভক্তের পক্ষে চাবি নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহার যোগানন্দ রসপান করা প্রয়োজন হইল, তিনি সেই চাবি সংলগ্ন করিয়া যোগের গৃহ খুলিলেন, আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে নানাবিধ যোগের তত্ত্ব, নানাবিধ যোগানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার নামরস এবং ভক্তিসুধা পান করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি ভক্তির গৃহ খুলিলেন, আর তৎক্ষণাৎ নামরস এবং ভক্তি সুধাতে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্ম-বিদ্যা এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হইল, তিনি সেই চাবি দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানালয় উন্মুক্ত করিলেন আর অপর্য্যাপ্ত পরি-মাণে জ্ঞানালোক আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আলোকিত করিল।

যিনি এইরূপ একটি ছোট সঙ্কেত জানিয়া বসিয়া আছেন তাঁহার আর কোন ভাবনা নাই। বাস্তবিক কোন ভক্ত যে সমস্ত স্বর্গ অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি একটি ক্ষুদ্র চাবি পাইয়াছেন যাহা দ্বারা তিনি যে বিষয় চাহিবেন, যে বিভাগের যে বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেই বিষয় এবং সেই বিভাগের সেই বস্তু লাভ

করিতে পারেন। একটি গুপ্ত স্থানে ভক্ত সেই চাবি লুকাইয়া রাখেন। সেই চাবি দ্বারা তাঁহার যে বিষয়ের জন্য যখন রুচি হয় তখনি তাহা লাভ করেন। সেই চাবি উপাসনার ঘর খুলিয়া ফেলে। খুব উৎকৃষ্ট আরাধনা, খুব গভীর ধ্যান, খুব উৎকৃষ্ট সরল প্রার্থনা, সেই চাবিটি ব্যবহার করিলেই এ সমুদয় তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দিকে ভক্তের নিজের কিছুই নাই, প্রেমরস নাই, পুণ্য নাই, উৎসাহ নাই; কিন্তু কাপড়ের কোণে একটি ক্ষুদ্র চাবি বাঁধা আছে। সুতরাং কিছু না পাইয়াও সকলই পাইয়াছেন, কেন না এই চাবি দ্বারা তিনি যখনই যাহা চাহিবেন তাহাই আসিবে।

কে আমাদের মধ্যে সমস্ত দিন কেবল জ্ঞান, ভক্তি, অথবা যোগ লইয়া থাকিতে পারেন? কেহই নহে। সর্ব্বদা সহস্র সঙ্গীত অথবা ধর্ম্মপুস্তক অথবা সহস্র বন্ধুকে সঙ্গে রাখা যায় না, তবে একটি উপায় রাখা চাই, যাহা দ্বারা আবশ্যক হইলেই সকলকে পাওয়া যাইতে পারে। কে ঘরের ভিতরে সকল মহাত্মাদিগের ছবি রাখিতে পারে? কিন্তু মনের মধ্যে যদি সঙ্কেত রাখিতে পারি যখন তাঁহাদিগের কাহাকেও ডাকিব তখনই তাঁহাকে পাইব। স্বর্গরাজ্যের সমুদয় পদার্থ, এবং সমুদয় মহাত্মা ভক্তের অধীন। এই জন্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও কথিত আছে অমুক সাধক অমুক দেবতাকে, অমুক ঋষিকে স্মরণ করিলেন আর তৎক্ষণাৎ সেই দেবতা, সেই ঋষি তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্মরণ করিলেই ভক্তিরাজ্য, প্রেমরাজ্য এবং যোগ-

রাজ্য হইতে ঈশ্বরের ভৃত্যেরা সুধার পাত্র হাতে লইয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। কি সেই সঙ্কেত? কি সেই চাবি? আমিও বলিতে পারি না, কেহই বলিতে পারে না; প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে সেই সঙ্কেত আছে, সেই চাবি আছে. প্রার্থনা করিতে করিতে সেই সঙ্কেত পাওয়া যাইবে।

যাঁহারা বলেন কেবল নাম কর, কেবল কীর্ত্তন কর, কেবল যোগ কর, অথবা কেবল শাস্ত্র পাঠ কর তাঁহারা জানেন না কিরূপে স্বর্গ অধিকার এবং ভোগ করা যায়। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বর্গের নিকটে রাখিয়াও দূরে রাখিয়াছেন। সর্ব্বদা আমরা স্বর্গ ভোগ করিবার উপযুক্ত নহি, তাই তিনি আপনার জিনিষ আপনার নিকট রাখেন। ঈশ্বর বলিবেন আমার জিনিষ আমার নিকটে থাকুক। তবে তিনি ভক্তের হস্তে চাবি দিলেন এই জন্য যে যখন তাহার ইচ্ছা হইবে, তখনই দ্বার খুলিয়া সে স্বর্গে প্রবেশ করিবে।

অনেক সাধনের পর ভক্ত পুরস্কার স্বরূপ এই চাবি লাভ করেন। এই চাবি লাভ করিলে সমস্ত ভক্তির ব্যাপার অতি সহজ হয়। তখন নাম করিতে করিতে দুই ঘণ্টার পর প্রাণ প্রমত্ত হইবে তাহা নহে, তখন একবার নাম করিলাম আর তখনই প্রাণ মুগ্ধ হইল। একবার ব্রহ্মদর্শন হইল, আর চক্ষু ফিরাইতে পারি না। একবার সেই পাদপদ্মের সুধা খাইতে আরম্ভ করিলাম আর মুখ তুলিতে পারি না। সমুদয় পাওয়া যায় অল্প সময়ের মধ্যে যদি সেই চাবি পাই। কি

জীবিত কিং মৃত সাধু যাঁহার সঙ্গ ইচ্ছা করিব অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহাকে পাইব, পুস্তকের গূঢ় মর্ম্ম পুস্তক দেখিবামাত্র বুঝিব। স্বর্গের যে বিভাগ, যে ভূমি খণ্ড অধিকার করিতে ইচ্ছা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তগত হইবে। স্বর্গের চাবির এত গুণ। এই চাবি পাইলে যে সাধু-কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিব বীরের ন্যায় উৎসাহের সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারিব।

রসনার সদ্ব্যবহার।

৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

সকল ভক্তেরাই রসনাকে সাধনের একটি বিশেষ যন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তির একটি উপায় বিশুদ্ধ রসনা। পরিত্রাণের একটি সোপান ভক্তিপূর্ণ কথা। কথারূপ পক্ষ দ্বারা মনুষ্য স্বর্গে আরোহণ করে। জিহ্বা সামান্য পদার্থ; কিন্তু ইহা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায়। রসনা যাহার জড় এবং শুষ্ক রহিল সে অন্যান্য উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেও এই দোষের জন্য স্বর্গধামে যাইতে অক্ষম হইবে। অতএব প্রত্যেক স্বর্গযাত্রীর পক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত, "রসনাকে অলস হইতে দিব না, এবং ইহাকে কেবল কতকগুলি শুষ্ক কথা কহিতে দিব না।" রসনা কেবল সত্য কথা বলিবে তাহা নহে, কিন্তু ইহা সেই

কথার মিষ্টতা আস্বাদন করিবে। মিষ্টতাশূন্য কথা ফলদায়ক হইতে পারে না। রসনার ভিতরে স্বর্গের সুধা নিহিত রহিয়াছে।

সৎপ্রসঙ্গ রসনার মিষ্টতা সম্পাদন করে। যে ব্যক্তি সৎপ্রসঙ্গ করে না তাহার রসনা বৃথা। অন্তরে ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করা অনেকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং উচ্চ ব্রত মনে করেন; কিন্তু রসনার যে একটি বিশেষ কার্য্য আছে তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারেন। মনে কর, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত রসনা কেবলই বিষয়ের কথা বলিল, রাগের পরিচয় দিল, একবারও ঈশ্বরের কথা বলিল না। যদি বল মন ঈশ্বরের পূজা করিয়াছে, মানিলাম মন ঈশ্বরের পূজা করিল এবং মনের উপকার হইল; কিন্তু রসনার কি হইল? তুমি কি ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ এবং সুন্দর করিবার জন্য জগতে আইস নাই? রসনায় ঈশ্বরের নাম গান করিয়া রসনার উপকার করা কি তোমার কার্য্য নহে? তোমার চক্ষু ব্রহ্ম দর্শন করিল, চক্ষুর কার্য্য হইল; কিন্তু ইহাতে কি তোমার সকল কার্য্য হইল? একটি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া অহঙ্কারী হইও না। রসনা দ্বারা যদি ঈশ্বরের নাম গান এবং সৎপ্রসঙ্গ না করিয়া থাক তবে রসনার জন্য পাতকী হইলে। রসনার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বতন্ত্র। রসনাকে জড় অবস্থায় রাখিবে না। মৃত রসনা করিয়া রাখিও না। সর্ব্বদা এই বলিবে "রসনা যাও, তাঁহার নাম

প্রচার কর, তাঁহার নাম উচ্চারণ কর।" ভক্তের জিহ্বা সর্ব্বদা জীবন্ত প্রাণবিশিষ্ট, এবং সরস ও সুমিষ্ট। রসনায় সেই মধুময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সুখী হইবে। কখনও সেই নাম শুষ্কভাবে উচ্চারিত হইতে দিবে না। শুষ্কভাবে উচ্চারণ করিলে ব্রহ্ম নামের রসাস্বাদন করা যায় না। তুমি ভাববিহীন হইয়া ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিলে, তোমার হৃদয় সেই নামের রস আস্বাদ করিতে পারিল না, কিন্তু তোমার পার্শ্বস্থ লোক সকল সেই রসাস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইল।

সংসারের অসার কথা উচ্চারণ করিতে করিতে জিহ্বা শুষ্ক হয়; কিন্তু আবার যখন সেই শুষ্ক রসনা জীবন্ত পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে তখন তাহা পুনর্জ্জীবিত এবং সুমিষ্ট হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রত্যেক কথার মধ্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রস নিহিত থাকে। সেই কথার অমৃত ভিতরে টানিয়া লইবে, সেই সুধা নিজে পান করিবে। সৎপ্রসঙ্গ এবং হরিগুণগানের প্রত্যেক কথাতে সুখ আছে, শান্তি আছে। একটি একটি কথা রসের কলস, রসের প্রস্রবণ। যখন ভক্ত ঈশ্বরের কথা আরম্ভ করিলেন তিনি আপনার কথায় আপনি সুখে ভাসিতে লাগিলেন। সেই নাম উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত রসাস্বাদন করিতেছেন। অতএব প্রথম উপদেশ রসনাকে জড় রাখিবে না, দ্বিতীয় উপদেশ রসনাকে শুষ্ক রাখিবে না।

রসনার উপরে মনুষ্যের চরিত্র নির্ভর করে। রসনা যাহার প্রকৃতিস্থ তাহার শরীর মন সুস্থ। রসনার অবস্থা দ্বারা শরীর মনের অবস্থা জানা যায়। মনের মধ্যে যখন রোগ থাকে তখন রসনাতে ব্রহ্ম নাম ভাল লাগে না, সৎপ্রসঙ্গ ভাল লাগে না। যাহারা ধর্ম্মজগতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারা যে কোন ব্যক্তির জিহ্বা দেখিয়া বলিতে পারেন তাহার অবস্থা সুস্থ কি অসুস্থ। যখন দেখিবে ভাল কথা বলিয়া সুখী হইতে পারিলে না তখন মনে করিবে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে দোষ জন্মিয়াছে, আজ কোন ভয়ানক পাপে বিকৃত হইয়াছি, নতুবা সুধা কেন তিক্ত বোধ হইতেছে। এমন সুধামাখা ব্রহ্ম নাম কেন সুধা আনিল না। রসনার এইরূপ দুরবস্থা দেখিলে রসনাকে ধৌত করিবে। ভক্তির সহিত বারম্বার নামকীর্ত্তন, এবং নামোচ্চারণ দ্বারা রসনা পরিষ্কৃত হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, মন সুখী হইবে। দেখ এই এক রসনার সাহায্যে কত লাভ হয়। রসনা কেবল একটি ছোট সামগ্রী, দেখিতে ছোট, কিন্তু ইহার কার্য্য মহৎ; ইহার এক কথা হয় মানুষকে মারিয়া ফেলিতে পারে, নয় বাঁচাইতে পারে; হয় পাপ বৃদ্ধি করে নয় পরিত্রাণের সহায়তা করে। অতএব জিহ্বা যদিও ক্ষুদ্র এবং সামান্য যন্ত্র; কিন্তু ইহা অতি সবল সামগ্রী। কেন না ইহাতে মনুষ্যকে বিনাশ কিম্বা অমর করা যায়।

অতএব সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া রসনাকে সুশাসনে রাখিবে।

যাঁহারা চারিদিকে আছেন ইহাঁদের কাহাকেও মিথ্যা কথা এবং দুর্ব্বাক্য বলিবে না। সর্ব্বদা সত্য কথা এবং সুমধুর কথা বলিয়া প্রতিবেশীর মঙ্গলসাধন করিবে। অতি উচ্চ অভিপ্রায় সাধনের জন্য ঈশ্বর রসনা দান করিয়াছেন। আমাদের রসনা যদি আমাদের বসে থাকে আমরা কত সুখে সুখী হইতে পারি। রসনাকে ভাল সুরে গান করিতে বলিব। রসনাকে অতি উৎকৃষ্ট বন্ধু বলিব। নির্জ্জনে সজনে আমাদের রসনা আমাদের পরিত্রাণের সহায় হইবে। অত্যন্ত দুঃখের সময় রসনা আমাদের বন্ধু হইবে। যখনই দেখিব প্রাণ মন শুষ্ক হইবে তৎক্ষণাৎ রসনায় সুমধুর স্বরে ব্রহ্ম নাম গান করিব। যখন কোন বন্ধুকে কাতর অথবা দুঃখিত দেখিব তখন তাঁহাকে দুইটি মধুময় কথা বলিয়া আসিব। এইরূপে রসনার সদ্ব্যবহার দ্বারা দিন দিন কল্যাণ বিস্তার করিব। এই ক্ষুদ্র রসনার দ্বারা আপনার কত সুখ সৌভাগ্য এবং জগতের কত কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে। ভক্তের পক্ষে রসনা একটি প্রধান যন্ত্র। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন রসনাকে যেন আমরা ধর্ম্ম সাধনের একটি প্রধান উপায়রূপে অবলম্বন করি।

বর্ষশেষে নিশিথ উপাসনা।

বুধবার, ৩০এ চৈত্র, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

বাল্যকালে বৃদ্ধেরা আমাদিগকে অন্ধকারে যাইতে নিষেধ করিতেন। তাঁহারা এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে অন্ধকারে ভূত, বিভীষিকা ইত্যাদি বাস করে। ধর্ম্মরাজ্যের বাল্যকালও এইরূপ। উভয় স্থলেই বালকের পক্ষে অন্ধকার ভয়ানক, অন্ধকার বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এখনও অন্ধকার মনে হইলে আমাদের গা ছম্ ছম্ করে। একাকী ঘোর অমাবস্যা রজনীতে বসিতে কাহার না শরীর কম্পিত এবং স্তম্ভিত হয়? কিন্তু ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম! কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ঈশ্বরকে প্রদর্শন করেন তিনি যেমন জ্যোৎস্নার ভিতরে বাস করেন তেমনি ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার অবস্থিতি। অধিকাংশ যোগী ঈশ্বরকে অন্ধকারময় গর্ত্তমধ্যে পাইয়াছেন। অনেকে সম্মুখস্থ আলোক নির্ব্বাণ করিয়া ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিয়াছেন, আবার অনেকে রজনীতে হাতে আলো ধরিয়া এবং দিবা দ্বিপ্রহরের আলোকের মধ্যে সেই জ্বলন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন।

যদি এই দুই কথাই সত্য হয় তবে আমরা কেন আলোর পক্ষপাতী হইব? কেন বলিব আলো না হইলে ঈশ্বরের প্রকাশ হয় না? এখন রাত্রি ঘোরান্ধকার, উহা সকাল পর্য্যন্ত এই অন্ধকার থাকিবে, এই অন্ধকার মধ্যে কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিব?

কেন, এ সময় কি ঈশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন? এই সময় যদি মন্দিরের কোন উপাসক তাঁহাকে ডাকে তিনি কি তাহাকে বলিবেন "আবার সূর্য্য উদয় হউক তবে তুমি আমার দেখা পাইবে?" আকাশে যতক্ষণ সূর্য্য থাকে ততক্ষণ কি সত্যসূর্য্যের অবস্থিতি? যখন সূর্য্য চলিয়া যায় তখন সূর্য্য কি পৃথিবীকে বলে "আমি তোর ঈশ্বরকে লইয়া চলিলাম?" অন্ধকার কি বলে "এখন আমার রাজ্য; এখন কেহই ধার্ম্মিক হইও না?" অন্ধকার কখনও এরূপ ভয়ানক কথা বলে না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি গভীর নিশিথ অন্ধকারকেও সাধন দ্বারা মিষ্ট করা যায়।

মনুষ্য তুমি মনে করিও না, আজ কাল ব্রাহ্মেরা অন্ধকারকে বাড়াইতেছেন। ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি চিরকাল সূর্য্যের আলোক, প্রদীপের আলোক, সম্পদের আলোকের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছ, এই জন্য অন্ধকারের মূল্য বুঝিতে পার না। অনেক দিন আলোকের মধ্যে অবস্থান করিলে অন্ধকারের মহিমা ভুলিয়া যাইতে হয়। অন্ধকারের মধ্যে কত রত্ন পাওয়া যায় অন্ধকার মধ্যে বাস না করিলে তাহা জানা যায় না। যিনি অন্ধকারের মধ্যে সুখভোগ করিয়াছেন, অধিকক্ষণ সূর্য্যালোকের মধ্যে থাকিলে তাঁহার মন অন্ধকারের জন্য ব্যাকুল হয়। কখন আবার সন্ধ্যার পর দয়ালের কাছে গিয়া বসিব, তিনি এই ভাবেন। এক বৎসরের পর এক রাত্রি ঈশ্বরের পূজা করিব ইহাতে কেন অবহেলা করিব? বর্ষান্তে একবার

নিশিথ সময়ে পিতাকে ডাকিব। এই সময় নির্জ্জন সাধনের কত সুযোগ হইবে। যত গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করিব তত ভিতরের নূতন শক্তি খুলিয়া যাইবে। মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে অন্ধকার মধ্যে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বের জন্ম হইয়াছে অন্ধকার মধ্যে। ঘোর অন্ধকার গর্ভে ঈশ্বরের আদেশ এবং সাহায্যে এই সকল তেজোময় চন্দ্র সূর্য্য গঠিত হইয়াছিল। অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের সংকল্প পূর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার না হইলে কেহ মন্ত্র শিখিতে পারে না। অন্ধকারে ভয় দেখিয়া যদি না কাঁদি, ঘোর অন্ধকার মধ্যে যদি ধ্যান না করি, বিপদের অন্ধকার মধ্যে যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় না হই, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন পূর্ণ হইতে পারে না।

দিন চলিয়া গেল। রাত্রি মৃত্যুকে আহ্বান করিল যখন দেখিব বাহিরের আলোক আসিয়া মনকে দুশ্চরিত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের মধ্যে গিয়া দ্বার বন্ধ করিব, এবং সেই অন্ধকার মধ্যে বৈরাগী হইয়া তপস্যা করিব। সেখানে দুই ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এবং নিজের উদ্ধারের বিশেষ উপায় সকল আবিষ্কৃত হইবে। আবার যখন আলোক আসিয়া মনকে চঞ্চল অথবা বিক্ষিপ্ত করিবে আবার সেই অন্ধকারে প্রবেশ করিব। অন্ধকার আমাদের শান্তি-ধাম। অতএব হৃদয়ের অন্ধকারকে কোন ব্রাহ্ম তুচ্ছ মনে করিও না।

এই নিশিথ অন্ধকার মধ্যে নিজের নিজের চরিত্রকে নিরীক্ষণ কর। চরিত্রের ভিতরে কত দাগ, কত কলঙ্ক লাগিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ৩৬৫ দিন অতিবাহিত হইল, আবার নববর্ষ আসিল। এই অন্ধকার এবং নির্জ্জনতার মধ্যে বসিয়া আপনাকে দেখ আর ঈশ্বরকে দেখ। পৃথিবীর অল্পদর্শী লোক আলো ধরিয়া আপনাকে দেখে। তোমরা ব্রাহ্ম, তোমরা অন্ধকারকে ডাকিয়া আনিবে। তোমরা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিবে ;—"এস ঈশ্বর, তোমাকে দুই একটি গুপ্ত কথা বলিব।" ঈশ্বর বুঝিবেন তুমি বৈরাগ্য-প্রিয় হইয়াছ গুপ্ত মন্ত্র তিনি কদাচ বাজারে প্রকাশ করিবেন না। অতএব ঘোরান্ধকারের ভিতর দিয়া গোপনে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে অভ্যাস কর।

বন গমন করিতে করিতে বলিতেছি না, অথবা কেবলই পৃথিবীর মধ্যে থাকিবে তাহাও নহে। যখন দেখিবে হৃদয়যন্ত্র বিকল হইয়াছে, তখনি অন্ধকার সাগরে ঝাঁপ দিবে। অন্ধকার সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে যখন অমৃত বাহির হইবে তখন জগৎ বুঝিবে অন্ধকার ভিন্ন রত্ন পাওয়া যায় না। অতএব হে ব্রাহ্ম সাধক, যদি রত্নপ্রিয় হও, তবে শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া অন্ধকার পূজা কর, কালপূজা কর। [নিশিথ সময়ের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি হইল !]

পুরাতন বর্ষ শেষ হইল। যাও তবে পুরাতন বৎসর। এস ঘোর দ্বিপ্রহরা রজনী, তোমার গাঢ় অন্ধকার মধ্যে যোগীরা,

দেবতারা যোগ সাধন করিয়াছেন, আমরাও তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করি। অনন্তকাল আমাদের জীবনের একটি বৎসর হরণ করিয়া লইল। মৃত্যুর এক বৎসর নিকট হইল, আমাদের পরমায়ুর এক বৎসর হ্রাস হইল। এক বৎসরের মৃত্যু হইল, এই জন্য প্রকৃতি দুঃখের চিহ্নস্বরূপ অন্ধকাররূপ কাল বসন পরিলেন। একজন পরিচিত বন্ধুর মৃত্যু হইল। পুরাতন বৎসর যাইবার সময় বলিয়া গেল, মনুষ্যগণ, তোমা-দের জীবন ক্ষীণ করিয়া চলিলাম। চিরকালের জন্য পর-মায়ুর এক বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি তাহা সঙ্গে লইয়া গেল না। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে।

নূতন বৎসর, তুমি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তোমাকে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিব? নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নূতন পবিত্রতার বসন পরিয়া যদি প্রাতঃকালে উঠিতে পারি তবেই আমরা ধন্য। ঈশ্বর সহায় হউন। তিনি আমাদের পুরাতন মনের মধ্যে নূতন পুণ্য দান করুন। তাঁহার কৃপা আসিয়া আমাদের চরিত্র নির্ম্মল করুক। আমাদের অন্য আশা ভরসা নাই। ঈশ্বরকে সহায় জানিয়া আবার এক বৎসরের জন্য জীবনতরিকে ভাসাইয়া দিই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

১১ই পৌষ, ১৭৯৬ শক।

[মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ।]

ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আসিয়াছেন কেবল সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য। সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য এবং সকল বিরোধী দলের মধ্যে স্বর্গীয় বন্ধুতা স্থাপন করা ইহাঁর উদ্দেশ্য। মীমাংসা শাস্ত্রের কথা তোমরা শুনিয়াছ, শান্তি সংস্থাপক বন্ধুর কথা তোমরা শুনিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যেখানে ঐক্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে ঐক্য স্থাপন করা ইহাঁর লক্ষ্য। পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতির মধ্যে যোগ এবং সমাধির ধর্ম্ম প্রবল ছিল। যখন মহর্ষিগণ সংসারের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ পর্ব্বতশিখরে বসিয়া আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন এবং একাকী প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দর্শন করিতেন। তখন সেই এক প্রকার ধর্ম্ম-প্রণালী ছিল। চারি শত বৎসর অতীত হইল নবদ্বীপ মধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্য ভক্তির সাধন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল জ্ঞান ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান মধ্যে নিমগ্ন থাকিলে ব্রহ্মকে হারাইতে হয়, এই জন্য ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য কি করিলেন? হৃদয়াসনে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে বসাইয়া সেখানে তাঁহার পূজা করিলেন। নামামৃত সকলকে পান করাইলেন। এক শত কেন, সহস্র সহস্র লোক নামামৃত পান করিয়া উন্মত্ত হইল। যে দেশ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, এই নামের

গুণে সেই দেশ সজীব হইল; যে স্থান মরুভূমি হইয়াছিল, সেই স্থানে হরিনাম বীজ বপন করাতে প্রেম ভক্তিপুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইল। এই হরি নামামৃত পান করিয়া সহস্র নর নারী আত্মাকে পোষণ করিল। কোথায় পর্ব্বতশিখরে নির্জ্জনে ব্রহ্মচিন্তা, কোথায় সহস্র সহস্র উন্মত্তদিগের মধ্যে একত্রিত হইয়া পিতার প্রেমে উন্মত্ত হওয়া, ইহা ভাবিলে মনে হয় এই মত পরস্পর কত বিরুদ্ধ। কিন্তু শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তা এবং কোমল ভক্তির সাধন এই দুইটিকে একত্র করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ধ্যানশীল মহর্ষির ঈশ্বর যিনি প্রেমিক ভক্তের ঈশ্বরও তিনি ইহা কে বুঝাইয়া দিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। সহস্র লোক প্রেম ভক্তিতে উন্মত্ত হইলে কল্পনার পথে পড়িতে হয়, কে এ কথার প্রতিবাদ করিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। মীমাংসার শাস্ত্র আমরা পাইয়াছি। শান্তি সংস্থাপক বন্ধুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দিন ইহাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে সেই দিন হইতে বুঝিয়াছি, পৃথিবীতে কোন প্রকার বিচ্ছেদ থাকিবে না, প্রেমের মিলন আসিবে। বন্ধুগণ! ধৈর্য্য অবলম্বন কর বিলম্বে আসিবে। সকল বিরোধী দল একত্রে বসিবে। ভক্তবৎসল ঈশ্বর সকলের মুখে তাঁহার নামসুধা ঢালিয়া দিবেন। অসম্ভব যাহা তাহা সম্ভব করিবেন ব্রাহ্মধর্ম্ম। ধ্যান এবং ভক্তিসাধনের ঐক্য হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মে। নিমীলিত নয়নে যদি সমস্ত দিন ব্রহ্মধ্যান করি, ইনি ব্রহ্ম নন, ইনি ব্রহ্ম নন, নেতি, নেতি, এইরূপ সাধন ক্রমাগত করিয়া অবশেষে

সকলের অতীত এক নিরাকার পুরুষকে দেখিব। সকলকে ভুলিয়া গিয়া একাকী ধ্যানগৃহে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। নির্জ্জনতার মধ্যে আপাততঃ অন্ধকার দেখিয়া মনে হয়, এ পথে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? এ পথে কি সুন্দর ঈশ্বরকে দেখা যায়? পূর্ব্বকালের সেই কঠোর সাধন-তত্ত্ব যদি আমরা অবগত হই তাহা হইলে দেখিব তাহার ফলও কেবল শুষ্ক। সেই সাধনে পৃথিবী ভাল লাগে না, স্ত্রী পুত্র সকলকে বিষবৎ মনে হয়, পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর উপর বিরাগ জন্মে, কেবলই নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাতেই ধ্যানপরায়ণ লোকের আনন্দ। পক্ষান্তরে অনেকে ভয় করেন যদি আমরা প্রেমোন্মত্ত হই, অবশেষে হয় তো ধ্যানবিহীন হইতে পারি, একাকী থাকা, বৃক্ষ লতার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা কঠিন হইবে, ধ্যানের নাম শুনিবা-মাত্র মনে বিরাগ হইবে। নির্জ্জনে থাকা কঠিন হইবে। তাঁহারা বলেন যেখানে ভ্রাতা ভগ্নী নাই সেখানে উপাসনা হয় না। এই উভয় দলের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম আশার কথা বলিতেছেন। ধ্যানশীল ব্যক্তিদিগের আশঙ্কা নাই, কেন না ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন প্রেমের ধর্ম্ম, ইহা তেমনই ধ্যানের ধর্ম্ম। সকলের নিকটে থাকিলেও নির্জ্জন, নির্জ্জনে থাকিলেও সজন এ কথা কেবল ব্রহ্মধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতি সুন্দর কথা। "সজনে নির্জ্জন, নির্জ্জনে সজন। সুকোমল ভক্তিপুষ্পের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর সাধন।"

ভক্ত ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিয়া মূর্চ্ছার অবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার মধ্যেও যথার্থ সাধকের আত্মাতে জ্ঞান চৈতন্য নিয়ত প্রস্ফুটিত হইতেছে। জ্ঞান বিহীন তিনি হন না যিনি প্রেমে উন্মত্ত হন, চৈতন্য নিজে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দূর হউক সেই কল্পিত কৃত্রিম ধ্যান যাহা মনুষ্যকে অন্তরে অন্ধকার দেখাইয়া ভীত করে। যাহাতে স্ত্রী পুত্র, সকলকে হারাইতে হয়। সেই বিবেকশূন্য, শান্তিশূন্য ধ্যান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে। থাকিবে সেই ধ্যান যাহার মধ্যে সুন্দর হইতে সুন্দরতর, মিষ্ট হইতে মিষ্টতর ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। কে বলে ব্রহ্মধ্যানে প্রাণ শুষ্ক হয়? যেখানে পাঁচটি গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে, যেখানে বেল, মল্লিকা প্রভৃতি আপনার আপনার স্বর্গীয় শোভা দেখাইয়া নয়ন মোহিত করে, যেখানে নদীর স্রোত অতি মধুরস্বরে প্রবাহিত হইতেছে; সেখানে একাকী তাঁহার ধ্যান করিলে আনন্দ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান কেমন মিষ্ট তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। একাকী ভক্ত ব্রহ্মধ্যানের অমৃত পান করিলেন, পিতা মুক্তহস্তে তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ঢালিয়া দিলেন। তিনি এই বলিয়া আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িলেন, কোথায় আমার পিতা মাতা, কোথায় আমার স্ত্রী পুত্র, কোথায় আমার প্রিয়জন,—এমন আনন্দ একাকী ভোগ করিতে পারি না।" এমন সুখ সকলকে ভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের আনন্দ আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি

আনন্দে বলিলেন স্বর্গ দেখিয়াছিলাম অন্তরে এখন বাহিরে। বান্ধব বিহীন হইয়া গিয়াছিলাম স্বর্গে, এখন বান্ধবদিগের মধ্যে স্বর্গ ভোগ করিতেছি। পৃথিবীর নরপতির এমন সুখ নাই। ধ্যানে এত সুখ প্রেমে এত সুখ, সজ্জন পিতার পূজায় এত সুখ নির্জ্জনে একাকী পিতাকে দেখিলে এত সুখ ইহা কে শিখাইলেন? ব্রাহ্মধর্ম। কি জানি কি হইতাম যদি ভক্তির বাগান ছাড়িয়া কঠোর ধ্যানের পথ অবলম্ব করিতাম। আবার কি জানি কি হইতাম যদি জ্ঞান চৈতন্য পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক উন্মত্ততায় মগ্ন হইতাম। কিন্তু প্রেমসিন্ধু তাহা হইতে দিবেন কেন? যেখানে তিনি আমাদের পরিত্রাতা সেখানে ভক্তি ধ্যানের সঙ্গে কলহ হইবে কেন? ভক্ত যেখানে মহর্ষি সেখানে। কেন না তিনি সত্যের আধার তিনিই প্রেমের আধার। এক চক্ষে দেখিব সূর্য্যকে, অন্য চক্ষে দেখিব চন্দ্রকে। সত্য প্রেমের বিরোধ থাকিবে না। ভক্ত ও ঋষিরও বিরোধ থাকিবে না। এই নামামৃত সমুদ্রের উপরে ভাসিলে ভাসিয়া যাইব। ভিতরে প্রবেশ করিলে নূতন নূতন রত্ন পাইয়া আমরা ধনী হইব। প্রথমতঃ আমরা দুঃখী কাঙ্গাল ছিলাম; কিন্তু আমাদের পিতা না কি ধনী, তাঁহার নামরত্নে তাঁহার নামানন্দে আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার নামস্বর্গে বাস করিয়া আমরা সুখী হইব। পৃথিবীর দুঃখ আর থাকিবে না! আনন্দের সংবাদ আসিয়াছে। বন্ধুগণ! এই নামানন্দে আনন্দিত হইয়া তোমরা পৃথিবীকে সুখী কর।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! তোমাকে আমরা দেখি জ্ঞান-চক্ষে, তোমাকে আমরা দেখি ভক্তিচক্ষে। যেমন তোমাকে দেখি সত্য বলিয়া, তেমনি তোমাকে দেখি আনন্দময় বলিয়া। ধ্যানশীল হইয়াও তোমাকে দেখি, ভক্ত হইলেও তোমাকেই দেখি। কত লোক কঠোর ধ্যান করিয়াও তোমাকে দেখিল না, আবার কত লোক কৃত্রিম প্রেমে মত্ত হইয়াও তোমাকে সত্যরূপে দেখিল না। আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ দুইই দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ভ্রম নাই, অসত্য নাই, সকলই সত্য, এই আমাদের প্রাণনাথ, কেমন সুকোমল, ইহাঁর মুখ দেখিলে আবার ইচ্ছা হয়, সকলকে দেখাই। প্রিয় পরমেশ্বর! ব্রাহ্মের কত সৌভাগ্য যে এমন সময়ে তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ দেখিতে অধিকারী হইয়াছেন। একটি ভিক্ষা চাই, যাহাতে ইহা অক্ষয় রক্ষা করিতে পারি এই ক্ষমতা দাও। প্রভু দয়াল! যদি তুমি সহায় হও তবে আমরা ধ্যান ধারণ, এবং প্রেম ভক্তি একত্র সাধন করিতে পারিব। যেমন ধ্যানশীল, তেমনই প্রেমিকহৃদয়ে তোমার পূজা করিব। যেন এই সুমিষ্ট পথ অবহেলা না করি। যোগীও হইব, ভক্তও হইব। এমন সুখের অবস্থা আর কোথায় পাইব? আরও প্রেমিক কর, আরও ধ্যানশীল কর। দেখ যেন এই দুঃখীদের কিছুতেই আর পতন না হয়। যতদিন বাঁচিব আশীর্ব্বাদ কর তোমার পবিত্র চরণ সেবা করিয়া যেন কৃতার্থ হই।

জ্ঞান ও ভক্তি।

[শ্যামবাজার চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে।]

জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুয়ের মিলনে জীবের পরিত্রাণ হয়। পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞান ভক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। অজ্ঞানতার অন্ধকার দ্বারা যাহার মন আচ্ছন্ন রহিয়াছে সে ব্যক্তি কিরূপে সত্যস্বরূপকে দেখিবে? ঈশ্বর অনেক, ঈশ্বর নানা প্রকার, অথবা ঈশ্বর ওখানে আছেন এখানে নাই এ সকল কুসংস্কারজালে যাহারা বদ্ধ তাহারা কিরূপে ঈশ্বরকে ভাল করিয়া দেখিবে? এ সমুদয় ভ্রমজাল ছেদন করিবার জন্য জ্ঞানাস্ত্র এবং এই অন্ধকার মোচন করিবার জন্য জ্ঞানপ্রদীপের প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের মন অন্ধকার এবং কুসংস্কারজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। জ্ঞানালোকের মধ্যে মনুষ্যের মন স্বাধীন হয়। যেখানে অজ্ঞানান্ধকার সেখানে অধীনতার শৃঙ্খল, সেখানে অনেক প্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা। জ্ঞানের আলোক যখন উজ্জ্বল এবং ঘন হইতে থাকে, তখন মনুষ্য আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে পারে, ঈশ্বরের প্রকৃতি দর্শন করে, ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হয়। কিন্তু জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে আয়ত্ত করা যায় না। জ্ঞান দেশ কালের শৃঙ্খল ছেদন করে; জ্ঞান ভ্রম কুসংস্কারের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া মনুষ্যকে প্রশস্ত অনন্ত আকাশে নিক্ষেপ করে। জ্ঞান ক্ষুদ্রস্বভাব মনুষ্যকে

স্বাধীনতারূপ উচ্চ অধিকার দান করে। জ্ঞান শৃঙ্খল ছেদন করে, ছোট কারাগার চূর্ণ করিয়া মনুষ্যকে অসীম আকাশে লইয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দিতে পারে না। কেন না, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরকে জ্ঞান দ্বারা যত ভাবিতে যাই, তত ভাসিয়া যাই। যখনই ইচ্ছা করি তখনি উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, ঊর্দ্ধ নিম্নে যতদূর ইচ্ছা ততদূর যাইতে পারি, কিন্তু এই অনন্ত আকাশরূপ সমুদ্রের কূল কিনারা নাই। যখন এই অসীম সমুদ্রে ভাসিয়া যাই তখন ভাবি এত বড় ঈশ্বরকে লইয়া আমি কি করিব? মন কিরূপে এত বড় ব্রহ্মকে ধারণ করিবে? অতএব ক্ষুদ্র ছাড়িয়া আকাশবিহারী পক্ষী হইলাম; কিন্তু আমার ঘরের ভিতরে ঈশ্বরকে না দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইল; এই জন্য জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ভক্তির আকার ধারণ করিয়া ভক্তিতে পরিণত হইল। যদি সেই বৃহৎ ঈশ্বরকে ঘরে লইয়া গিয়া আমি আপনার লোক করিতে না পারি তবে তাঁহার প্রতি অনুরাগ হইবে কেন? যদি নিকটস্থ সহায়কে ঘরের মধ্যে না দেখিতে পাই তবে বিপদের সময় কে আমাকে রক্ষা করিবে? এই খেদ মিটাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মভক্ত হন। যখন আমাদিগের অন্তরে এই ভক্তি এবং অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় তখন আমরা দেখিতে পাই আমাদিগের ঈশ্বর আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে আছেন। আমাদিগের হৃদয় যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয় তখন আমরা বলি;—"আমরা অত বড়

আকাশে আর ভ্রমণ করিতে পারি না, ঈশ্বর! তুমি আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রকাশিত হও। হে ব্যাকুল অন্তরের ঈশ্বর! তুমি আনন্দরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত হও।” ভক্তি এইরূপে অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত দূরস্থ প্রকাণ্ড ঈশ্বরকে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন। পৌত্তলিক ভক্ত জড় হইতে পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করে; কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত অনন্ত ঈশ্বরকে নিরাকার রূপ দিয়া পূজা করেন। ব্রহ্মভক্ত বলেন, “আমি বিশ্বাস করি সত্যস্বরূপ ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু তাঁহার রূপ দর্শন না করিলে আমার হৃদয়ে শান্তি হয় না।” অতএব ব্রহ্মভক্ত ভক্তবৎসল অনন্তের নিরাকার রূপ ভাবেন। তিনি অনন্তকে চক্ষের নিকটে দর্শন করেন। ঈশ্বরের জ্ঞানের রূপ, প্রেমের রূপ, পুণ্যের রূপ দেখিতে দেখিতে ভক্ত প্রমত্ত হইয়া কাঁদিতে থাকেন। ভক্তির উদয় হইলে সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মকে সহজে ধরা যায়। ভক্ত ঈশ্বরকে আপনার আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া বলেন:—“ইনিই সেই প্রেমপুণ্যে অনুরঞ্জিত ঈশ্বর, যিনি অনন্ত আকাশে বাস করেন!” তখন তিনি কি বৃক্ষতলে, কি নদীতটে, যেখানে বসেন সেখানেই সেই বৃহৎ ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পান। তখন তাঁহার জ্ঞান সুমিষ্ট হইয়া আসে। দেখ, যথার্থ ভক্তের নিকটে পৌত্তলিকতা পরাস্ত হইল। পাথরের রূপ প্রেমের রূপের তুল্য নহে। অতএব ব্রহ্মভক্তের জয় হইল। এই নিরাকার সুন্দর রূপ যাঁহারা না

ভাবেন তাঁহারা দুঃখী। অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে হইবে না, ব্রহ্মভক্ত হও। আকাশের দেবতাকে হৃদয়ের ভিতরে আনিয়া পূজা কর। আকাশ অপেক্ষা হৃদয় বড়— যে হৃদয় প্রেমে বিস্তারিত তাহা অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যকে ধারণ করিতে পারে। ঈশ্বরের সেই ঘনীভূত প্রেম পুণ্যের রং দেখিলে হৃদয় মন সহজেই ভক্ত এবং যোগীর ভাব ধারণ করে। জ্ঞান ভক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যতীত সত্য দর্শন হয় না, এবং ভক্তি বিনা ঈশ্বরকে নিকটে লাভ করা যায় না। কেবল প্রকাণ্ড একটা অনন্ত ভাবিতে ভাল লাগে না, এই জন্য ভক্তির প্রয়োজন। নিরাকার আকাশবাসী ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ের ঘরে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। তিনি ভিক্ষুকের পূজা গ্রহণ করেন, তিনি ভিখারী ভক্তের মুখে সুধা ঢালিয়া দেন। ভক্তের নিকটে তিনি ফুলের ন্যায় সুন্দর এবং সুমিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান পরিশেষে ব্রহ্মভক্তিতে পরিণত হয়।

প্রকৃত সাধক নিপুণ বিষয়ী।

রবিবার. ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

বিষয়ী এবং সাধকের মধ্যে কি প্রভেদ? কেহ বলেন যিনি কেবল বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন এবং ধর্ম্মসাধনে অবহেলা

করেন তিনি বিষয়ী, আর যিনি দিবা নিশি ধর্ম্মসাধনে অনুরক্ত এবং বিষয়কে উপেক্ষা করেন তিনি সাধক; কিন্তু ইহা যথার্থ প্রভেদ নহে। যথার্থ প্রভেদ এই, যিনি সাধক তিনি নিপুণ বিষয়ী, ধর্ম্মক্ষেত্রে যেমন দাবানলের ন্যায় তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ, বিষয় কর্ম্মেও তিনি তেমনি উদ্যমপূর্ণ এবং উৎসাহী। আর যাঁহার অন্তরে তেজ নাই, উৎসাহ নাই, যিনি আশা এবং উদ্যম বিহীন তিনিই বিষয়ী। এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া অথবা কতকগুলি বাহিরের কার্য্য করা উৎসাহ নহে। সত্যের সৌন্দর্য্য, পুণ্যের জ্যোতি এবং প্রেমের মধুরতা ভোগ করিয়া যে অন্তর মুগ্ধ হয় তাহাই আত্মার উৎসাহ। সে ঘোর বিষয়ী যাহার এই উৎসাহ নাই। সে ব্যক্তি বিষয় কার্য্যও ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহার ঘর সংসার শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না, সে পদে পদে আপনার মূর্খতা এবং হৃদয়ের নির্জ্জীবতার পরিচয় দেয়। তাহার হৃদয় অগ্নিময় হয় না, সংসারের বায়ুতে তাহার হৃদয় শীতল হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে আমি যোগী সাধক বলিয়া প্রণাম করি যিনি কি ধর্ম্মক্ষেত্রে কি বিষয় কার্য্যে প্রদীপ্ত। যাঁহার চিন্তা অগ্নিময়, যাঁহার কার্য্য অগ্নিময়, তাঁহার অন্তরে এত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে যে তাহার উপর সংসার সমুদ্র আসিয়া পড়িলেও তাহা নির্ব্বাণ হয় না। ঈশ্বরের আশ্রিত সাধক সর্ব্বদাই তেজস্বী, তিনি সকল দিক রক্ষা করিতে পারেন। তিনি উপাসনার সময় যেমন ভক্তির মধুরতা এবং যোগের গাম্ভীর্য্য

রস পান করেন, সংসার রণক্ষেত্রেও তেমনি প্রকাণ্ড ব্যস্ততার অবতার। এক দিকে যত ধ্যান যোগের গাম্ভীর্য্য অন্য দিকে তত কার্য্যের নৈপুণ্য। যত ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মজ্ঞানের গভীরতা ততই উৎসাহ এবং উদ্যম। ভক্তিরস পান করিয়া যাহার প্রাণ শীতল এবং প্রমত্ত হয় সংসারের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাহার কি করিতে পারে? যাহারা এইরূপ গভীর ধর্ম্মসুধা পান করিতে পায় না কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে তাহাদের চিত্ত-বৈকল্য এবং মনের বৈষম্য উপস্থিত হয়। যাঁহার অন্তরে প্রেমমত্ততা জন্মিয়াছে তাঁহার পক্ষে জ্ঞান, ভক্তি এবং কার্য্যের ব্যস্ততা সকলই সমান। পাগল যে তাহার কাছে সকলই পাগলামি। যাহার প্রাণ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত, তিনি ঈশ্বর ভিন্ন, আর স্বতন্ত্র বস্তু কি দেখিবেন? তাঁহার দুই চক্ষু, কিন্তু দুই চক্ষু দেখে এক বস্তু, দুই বস্তু নহে। সাধক ধর্ম্মকে পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র দেখেন না। ধর্ম্মের প্রমত্ত অবস্থায় যখন হৃদয় আরূঢ় হয় তখন তাঁহার পক্ষে স্বর্গের কার্য্য যেমন সুখপ্রদ, পৃথিবীর কার্য্যও তেমনি শান্তিদায়ক হয়। যথার্থ সাধক জানেন, যিনি তাঁহার উপাস্য তিনিই তাঁহার প্রভু। তিনিই একেরই কার্য্য করেন, একেরই হস্ত হইতে পুরস্কার লাভ করেন। প্রকৃত সাধকের নিকটে ধর্ম্ম এবং সংসার এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকে না, এই দুই এক। তিনি যেমন ষোল আনা উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম-সাধন করেন, তেমনি ষোল আনা প্রমত্ততার সহিত সংসার

পালন করেন। তিনি কোথাও সাড়ে পনের আনায় সন্তুষ্ট হন না। এই নিয়মটি ধর্ম্মার্থী সকলেরই পালন করা উচিত। প্রেম, ভক্তি, ধ্যান, বৈরাগ্য যখনই যাহা গ্রহণ করিবে পূর্ণ ষোল আনা মাত্রায় গ্রহণ করিবে। যখন উপাসনা করিবে, হে জীব, তখন তুমি এই মনে করিও যে তুমি কেবল উপাসনা করিতেই জগতে আসিয়াছ; কেবল ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দরস পান করাই তোমার কার্য্য; পৃথিবীতে আর কোন কার্য্য নাই। আবার যখন কার্য্যালয়ে থাকিবে পূর্ণ ষোল আনা কার্য্য করিবে। ব্রাহ্ম যিনি তিনি ষোল আনা সংসার করেন। যাহারা কম করে তাহারা ঘোর বিষয়ী। ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা সংসার করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ষোল আনা সংসার করিয়াছিলেন। যেমন ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য প্রভৃতি। যখন ষোল আনা প্রমত্ততার সহিত সংসারের কার্য্য করিবে তখন ঈশ্বর জানিতে পারিবেন যে সেই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার সেবা করা ব্যতীত তোমার অন্য ইচ্ছা কিম্বা অন্য কামনা নাই। কি ধর্ম্মসাধনে কি কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার পক্ষে কেবল এইটুকু চাই, যে তুমি সর্ব্বদাই তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য প্রমত্ত হইয়া থাকিবে। তোমার কার্য্যের ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ আসিল; "ধ্যান কর" তৎক্ষণাৎ তুমি কাগজ কলম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতে নিযুক্ত হইবে, তখন মনে করিবে যেন তুমি কেবল ধ্যান করিবার জন্যই জন্মিয়াছ, তখন আর কোন

চিন্তাকে মনের মধ্যে স্থান দিবে না। অথবা উপাসনায় মত্ত রহিয়াছ এমন সময় স্বর্গ হইতে আদেশ আসিল "দান কর' তৎক্ষণাৎ সেই মস্তক অবনত করিয়া সেই আদেশ পালন করিবে। ইহাতে যোগের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না। যাঁহার উপাসনা করিতে করিতে প্রাণ প্রমত্ত হইয়াছে তাঁহারই আদেশানুসারে যদি দান কর তাহাতে কিরূপে তাঁহার সহিত যোগ ভঙ্গ হইতে পারে? অতএব যদি সংসার এই ধর্ম্ম উভয়ই চাও, তবে পূর্ণ উৎসাহে মত্ত হও। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহার সাধকেরা পূর্ণ উৎসাহে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম এবং সংসারের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

ধ্যান।

রবিবার, ১০ই পৌষ, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

সাধনের অতি উচ্চ অবস্থা ধ্যান। ধ্যান নিম্ন শ্রেণীর ব্যাপার নহে। সাধনের পথে অনেক দূর অগ্রসর না হইলে ধ্যানস্পৃহা জন্মে না। ধ্যান করিব কেন? আরাধনা, প্রার্থনা দ্বারা কি আত্মার কামনা পূর্ণ হয় না? যোগী ঋষিরা ধ্যান করিতে চান করুন, তোমার আমার জন্য ধ্যানের কি প্রয়োজন? এ সকল কথা দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর সাধকেরা ধ্যানের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। যেমন অনেকগুলি পুষ্প কেবল

পর্ব্বতের উচ্চতর স্থানে দেখা যায়, নিম্ন স্থানে দেখা যায় না, তেমনি ধ্যানপুষ্প কেবল উচ্চ শ্রেণীর কতকগুলি সাধকের জীবনেই আপনি প্রস্ফুটিত হয়। তাঁহাদিগের পক্ষে ধ্যান করা স্বাভাবিক। ধ্যানস্পৃহা কখন হয়? যখন মনুষ্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, এই যে তুমি ঈশ্বরকে এত ডাক, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতে পার, ঐ আমার ঈশ্বর? মনুষ্য যখন পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে না দেখিলে তাহার কিছুতেই শান্তি হয় না। ঈশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে, তাঁহার প্রেমবারি পান করিবার জন্য অন্তর তৃষিত হয়। যখন সে তাঁহার দর্শন লাভ করে তখন দীপ্ত শিরার অভিষেক হয়। এই ব্যাকুলতার অবস্থায় যাহারা যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না তাহারা কল্পিত দেবতার পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া স্ব স্ব ঈশ্বরদর্শনস্পৃহা চরিতার্থ করে। এই জন্যই পৃথিবীতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মগণ, যথার্থ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন এবং ধ্যান করিয়া তোমরা যদি এই অভাব মোচন না কর, তোমাদিগকেও এক দিন পৌত্তলিক হইতে হইবে। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ এমন একটি লোক চায় যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ অথবা যাঁহাকে ধারণ করিয়া সুস্থির হইতে পারে, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া নির্ভর হইতে পারে এবং যাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া প্রাণ শীতল করিতে পারে। ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিয়া দশ বৎসর

কাঁদিলাম, অথচ কোন বস্তু ধারণ করিতে পারিলাম না, অন্তরে বাহিরে শূন্য পরিহাস করিতে লাগিল, এই অবস্থায় কেহই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যখন অন্তরে এই শূন্যতা বোধ হয় তখন ধ্যান আরম্ভ হয়। চারিদিকে রাশি রাশি বিষয় বৈভব রহিয়াছে সত্য, কিন্তু পরিত্রাণার্থীর নিকটে এ সমস্ত অসার এবং মিথ্যা। তাঁহার প্রাণের মধ্যে এই অনন্ত সৃষ্টি একটি প্রকাণ্ড শূন্য এবং ভয়ঙ্কর অন্ধকার বোধ হয়। এই যে শূন্য বোধ ইহা ধ্যানস্পৃহা জন্মাইয়া দেয়। মন স্বয়ং নিরাকার, অতএব স্বভাবতঃই ইহা নিরাকারের পক্ষপাতী। যখন এই ধ্যান-স্পৃহা প্রবল হয় তখন মন আপনা আপনি সমস্ত সাকার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারময় নিরাকার অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। জলের ভিতরে নিমগ্ন হইলে যেমন সমস্ত শরীর জলে পরিপূর্ণ হয় সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মসাগরে মগ্ন হইলে আত্মার পূর্ণাবস্থা হয়। শূন্য হইতে জলে অবতরণ করিলাম, জলে সমস্ত অঙ্গ পূর্ণ হইল, একটি পদার্থ স্পর্শ হইল; সেইরূপ যখন অসত্য হইতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সত্ত্বা সাগরে প্রবেশ করিলাম তখনই শুষ্ক শূন্য আকাশ প্রেমময়ের আবির্ভাবে পূর্ণ। আকাশ পূর্ণ হইল, ক্রমাগত সাধন দ্বারা শূন্য পূর্ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে পরিণত হইল। তখন আর শূন্য পরিহাস করিতে পারে না, শূন্যের মৃত্যু হইয়াছে। শূন্যের পরিবর্ত্তে পূর্ণব্রহ্ম আসিয়াছেন। অনেক দিন ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিলাম, অনেক প্রকারে তাঁহার স্তব স্তুতি

এবং আরাধনা করিলাম, অনেকবার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম, তথাপি মনের শূন্য ভাব দূর হইল না, ভাবিতে যাই সব শূন্য দেখি, এই অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর। এই সময়েই মন একটি সত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য আকুল হয়। এই আকুলতাই ধ্যানস্পৃহার উৎপত্তির কারণ। সহজ বিশ্বাস এবং মনোবিজ্ঞান উভয়ই এক বাক্য হইয়া বলিতেছে, সত্যের সত্য একজন আছেন। সত্য কি পদার্থ? যাহা পদার্থ তাহাই সত্য। তবে কেন এই সত্য ধারণ করা যায় না? এই যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত সত্য, চক্ষু কেন ইহা দর্শন করিতে পারে না, এবং বুদ্ধি কেন ইহা অনুভব করিতে পারে না? অনন্ত আকাশে এই পূর্ণ সত্য বিদ্যমান, অন্তর বাহির সমস্ত দিক এই পরম পদার্থে পরিপূর্ণ তথাপি কেন শূন্য বোধ হয়? এই ভয়ঙ্কর শূন্য বোধ নাস্তিকতার অবস্থা। বিশ্বাসীর নিকট এই আকাশ শূন্য নহে, ইহা ঈশ্বরের বর্ত্তমানতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার নিকট সত্য করতল ন্যস্ত। সত্য-পরায়ণ যোগী, ধ্যানশীল বিশ্বাসী সর্ব্বত্রই এই সত্য দর্শন করেন। তিনি কি অন্তরে, কি বাহিরে, কোথাও শূন্য দেখেন না। শূন্য বোধ করা ভয়ানক যন্ত্রণার অবস্থা। এই অবস্থায় কেহই অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। এই শূন্য যন্ত্রণায় উত্তপ্ত আত্মা হয় তো কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে, নতুবা স্বভাবতঃ নিরাকার ব্রহ্মসাগরে নিমগ্ন হয়। যখন ইহা যথার্থ ঈশ্বরকে লাভ করে তখনই প্রকৃত ধ্যানের

জয়ধ্বনি হয়। ব্রহ্মের সত্তা অনুভব করাই ধ্যান। ব্রহ্মের আবির্ভাব পরম পদার্থ। যে দিন এই আবির্ভাব অনুভব করিতে পারি না সেই দিন চারিদিক শূন্য জ্ঞান হয়, মন নিস্তেজ এবং বিষণ্ণ হয়। এইরূপ শূন্যজ্ঞান এবং পাপ করা প্রায় উভয়ই সমান। কেন না সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাই অসত্য এবং পাপের অবস্থা। হস্ত দ্বারা যেমন জড় চরণ ধারণ করা যায়, তেমনি আত্মা দ্বারা নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার চরণ স্পর্শ করা যায়। আমরা যেমন পরস্পরের মুখ চক্ষু দেখি, তেমনি ঈশ্বরের প্রেমমুখ এবং প্রেমচক্ষু দেখা যায়। দেখা যায় এই কথা যদি বলিতে না চাও, অনুভব করা যায় এই কথা ব্যবহার কর। যোগী ব্রহ্মদর্শন অথবা ব্রহ্মধ্যান করেন অর্থাৎ পরম সত্য ব্রহ্মকে অনুভব করেন। তিনি আহ্লাদের সহিত চীৎকার করিয়া বলেন ঃ—"আমি এই সত্য ধারণ করিয়াছি, এই সত্যে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে।" কেবল ধ্যানশীল মনুষ্যই দৃঢ়তার সহিত ঈশ্বরের এইরূপ পরিচয় দিতে পারে না। তাঁহার প্রাণ অতি সহজে ব্রহ্মরূপ অগাধ জলে মগ্ন হয়। ঈশ্বর তাঁহার করতল ন্যস্ত ধৃত বস্তু। ধ্যান-পরায়ণ যোগীর সমস্ত আত্মা ব্রহ্মময়। যাঁহারা সরোবরে অবগাহন করেন তাঁহারা যেমন বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ জলময়, তেমনি যাঁহারা ধ্যান করেন তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন তাঁহা-দিগের প্রাণ ব্রহ্ম-সত্তায় পরিপূর্ণ। যখন এই প্রকার

অনুভব দ্বারা বলি "ঈশ্বর আছেন" তখনই প্রকৃত ধ্যান আরম্ভ হয়।

উপাসকের সঙ্গে উপাস্য দেবতার মৃত্যু।

রবিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

উপাস্য দেবতার সহমরণের কথা কি তোমরা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক তবে সাধকগণ, শ্রবণ কর। মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করা, বল বীর্য্যহীনকে বল প্রদান করা, নিরুপায়ের উপায় করিয়া দেওয়া এবং পাপীকে উদ্ধার করা, এ সকল দেবতার কার্য্য। পৃথিবীতে যুগে যুগে দেবতাই এ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। উপাসক ভক্তিভাবে তাহার উপাস্য দেবতাকে ডাকিল, উপাস্য দেবতা প্রকাশিত হইয়া তাহার পাপ দুঃখ দূর করিলেন এবং তাহার অন্তরে আপনার অসীম ক্ষমতা বিস্তার করিলেন; কিন্তু অদ্যকার কথা আর এক প্রকার। চিরকাল আমরা শুনিয়া আসিয়াছি মনুষ্যের উপরেই দেবতার আধিপত্য; কিন্তু আজ আমি বলিতেছি দেবতার উপরেও মনুষ্যের এক প্রকার ক্ষমতা আছে। মনুষ্য জীবিত দেবতাকে বধ করিতে পারে, উৎসাহের প্রচণ্ড সূর্য্য-স্বরূপ জ্বলন্ত দেবতাকে শীতল জলের ন্যায় অসাড় করিতে পারে। মনুষ্য যদি ইচ্ছা করে আপনার আত্মাকে নির্জ্জীব

করিতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেবতাকেও মৃত মনে করিতে পারে। এই দেশে স্বামীর সঙ্গে যেমন স্ত্রীর সহমরণ প্রথা প্রচলিত আছে সেইরূপ পৃথিবীতে অনেক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যের মৃত্যু হয়। ইতিহাস এ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখাইয়া দিতেছে। যুগে যুগে দেখা গিয়াছে মনুষ্য পাপ-হ্রদে ডুবিয়া কেবল নিজে মরিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু সে আপনার ইষ্ট দেবতাকে সঙ্গে লইয়া মরিয়াছে। সে মনে করিয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইষ্ট দেবতাও মরিয়াছেন। এই জন্যই আজ পৃথিবীতে শত সহস্র মৃত দেবতা দেখা যায়। উপাসকদিগের উৎসাহপূর্ণ অবস্থায় যে সকল দেবতা হুঙ্কার ভিন্ন মৃদুভাবে কথা কহিতেন না এখন সে সকল দেবতা নাই। উপাসকদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সে সকল দেবতারও সহমরণ হইয়াছে। যখনই কোন উপাসক বলিল আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন নূতন নূতন ফুল লইয়া আমার দেবতার পূজা করিতাম, এখন আর সেরূপ পারি না, আমার হৃদয়ের প্রেম ভক্তি পুরাতন হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, তখনই তাহার নিকটে তাহার দেবতাও পুরাতন এবং শুষ্ক বোধ হইল। যখন উপাসক বলিলেন আমি আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন সতেজ এবং সরস কথায় ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতে পারি না, ঠিক সেই লগ্নে তাহার ঈশ্বরও বলিলেন আমার কথাতেও আর তেমন জোর এবং মধুরতা নাই। যাই উপাসক বলিল আমি

যে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইব আমার আর এমন আশা নাই, ঠিক সেই সময়ে তাহার উপাস্য দেবতাও বলিলেন আমারও আর ক্ষমতা নাই যে তোমার আশাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিতে পারি। যাই উপাসক বলিল, আমার নাড়ীতে প্রাণ নাই, অমনি তাহার উপাস্য বলিলেন আমিও আর থাকিব না। যেমন উপাসকের মৃত দেহ পড়িয়া রহিল তেমনি তাহার সঙ্গে উপাস্য দেবতার মৃত প্রস্তরও পড়িয়া রহিল। দেখ অবিশ্বাসী হইলে কি হয়। অবিশ্বাস রোগ যে কেবল মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে তাহা নহে, আবার যেখানে সেই রোগের ঔষধ আছে তাহাও অস্বীকার করে। অবিশ্বাস অস্ত্র মনুষ্যের প্রাণ কাটে, আবার যে স্থান হইতে প্রাণ লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহাও ছেদন করে। অবিশ্বাস অগ্নি কণ্ঠ শুষ্ক করে, আবার যে নদীর জলে কণ্ঠ সরস করা যায় ইহা দ্বারা সেই নদীর জলও শুষ্ক হয়। অবিশ্বাস অন্ধকার কেবল উপাসকের জ্ঞান জ্যোতি হরণ করে তাহা নহে; কিন্তু যিনি জ্ঞানের আধার বিশ্বগুরু তাঁহাকেও অস্বীকার করে। গুরু নিকটে থাকিলে দুই এক দিন পাপের কুমন্ত্রণায় জড়িত হইলেও ভয় নাই, কেন না গুরুর সাহায্যে নিশ্চয়ই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি, আমি পাপ বিষ পান করিয়া মৃতপ্রায় হইলেও এই যে জীবন্ত জাগ্রত গুরু তাঁহার কৃপাতে বাঁচিব এই আশা করিতে পারি, কিন্তু অবিশ্বাস এই আশার মূল পর্য্যন্ত ছেদন করে। অবিশ্বাস শত্রু বলে আমি তোকে তো

মারিবই, আবার তোর সমক্ষে তোর প্রাণের প্রিয় দেবতার মুণ্ডও ছেদন করিব। এইরূপে উপাসকদিগের অবিশ্বাস বশতঃ এক সময়ের জাগ্রত প্রসিদ্ধ দেবতা অন্য সময়ে নিদ্রিত অথবা মৃত হইয়াছে। তাহারা নিজ মুখেই বলিয়াছে, আমাদিগের সেই জ্বলন্ত দেবতার এখন আর জীবন নাই। ব্রাহ্ম-গণ, তোমাদের যে এই দুর্দ্দশা না হইবে কে বলিল? ঈশ্বর করুন এমন যেন না হয়। আমরা মরি ক্ষতি নাই; কিন্তু দেবতা মরিলে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইবে। দেবতা জীবিত থাকিলে আমাদের ভয় নাই। আমরা লজ্জা, অন্ধকার এবং মৃত্যুতে আচ্ছন্ন হই; কিন্তু ঈশ্বর চিরজীবন্ত, চিরতেজস্বী এবং চিরজাগ্রত ও চিরপবিত্র থাকেন। অতএব ঘোর বিপদকালেও বলিব "বিধাতঃ, তুমি যেমন মনোহর তেমনি আছ, আমিই কেবল অন্ধ হইয়াছি।" ভ্রাতৃগণ, তোমাদের অবিশ্বাস অন্ধকার কি এতদূর প্রগাঢ় হইবে, যে তাহাতে এমন সুন্দর ঈশ্বর নির্জ্জীব এবং মলিন হইয়া যাইবেন? জীবন্ত ঈশ্বর, নীচে বস, আমরা অবিশ্বাস খড়্গ দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব—এরূপ ভয়ানক কথা তোমরা না বলিতে পার; কিন্তু ঈশ্বর কথা কহেন না, তিনি নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে শাসন করেন, তাঁহার তত বল নাই যে একেবারে আমাদিগকে ভাল করিতে পারেন, তোমরা এ সকল কথা বলিতে পার। এ সকল কথা শুনিয়াই বলিতেছি দূর হও অবিশ্বাস, আর তোকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তুই আমাদের ভিতরে

থাকিয়া সর্ব্বনাশের জাল বিস্তার করিয়াছিস্, তোর প্রভাবে আমাদের তেজস্বী ঈশ্বর [যিনি বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অগ্নি ছড়াইতেন] নির্জ্জীব এবং ম্লান হইয়াছেন।' এখন তোর মুণ্ডপাত করিয়া চিরকাল "জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জীবন্ত ঈশ্বরের জয়," এই কথা বলিল।

ঈশ্বর বাণী এবং মনুষ্য ভাষা।

রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

বঙ্গ ভাষার এত নিন্দা করিতেছি কেন? অবশ্যই অর্থ আছে। সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী হওয়ার কারণ আছে। ঈশ্বরের মুখের ভাষা যদি সংস্কৃত হয়, তজ্জন্য মনুষ্য আনন্দ মনে আধুনিক বঙ্গ ভাষা বিদায় করিয়া দিবে। স্বর্গীয় ভাষা আসুক, পার্থিব ভাষা চলিয়া যাক্ ভক্ত মাত্রই এই প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি সংস্কৃত ভাষাতে মনুষ্য স্বর্গ-গামী এবং নিকৃষ্ট বঙ্গ ভাষাতে মনুষ্য অধোগামী হয়। অতএব ভাষা বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। ভাষা কর্ষণ করিতে হইবে, ঈশ্বরের ভাষা বুঝিতে শিখিলে অত্যন্ত উপকার হইবে। পৃথিবীর বাঙ্গালা ভাষা পড়িয়া ঈশ্বরের সত্বায় বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের ভাষা শিখিয়া ঈশ্বরের সত্বায় বিশ্বাস করিতে হইবে।

ভক্ত ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিবার জন্ত ব্যাকুল। এক জন অন্ধকার ভেদ করিয়া গভীর স্বরে বলিলেন, "আমি আছি" ইহা শ্রবণ মাত্র ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল। "আমি আছি" ইহা অপেক্ষা সহজ ভাষা নাই। ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে বাস করিতেছেন। মনুষ্যের এ সমস্ত পার্থিব ভাষা দুর্ব্বল এবং হীন, ইহাতে পরিত্রাণ হইতে পারে না। যখন আকাশ ভেদ করিয়া "আমি আছি" এই দুটি শব্দ মনুষ্যের অন্তরে আসিল তখন ঈশ্বরের সত্ত্বায় তাহার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মিল। ঈশ্বর স্বয়ং শিষ্যের উপনয়ন করিলেন। ঈশ্বর দ্বারা দীক্ষিত হইয়া শিষ্য অমৃতধামের অর্দ্ধেক পথ চলিয়া গেল। এই নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের সহিত শিষ্য যখন ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে "তুমি আছ" এই কথা বলিল, তখন তাহার চক্ষে ভক্তি ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি গ্রন্থ দ্বারা কি এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়? মনুষ্যের ভাষা নির্জ্জীব, ব্রহ্মের ভাষা সজীব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল সমাগত হয়। স্বর্গীয় ভাষা যিনি জানেন তিনি ঈশ্বরের কথায় মধুর স্বর শ্রবণ করেন। লিখিত শাস্ত্র মৃত, তাহাতে উপদেষ্টা অথবা বক্তার স্বর শ্রবণ করা যায় না। সাধু উপদেষ্টার সজীব এবং সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিলে যেমন মন মোহিত হয় দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ উপদেশ পাঠ করিলে কি তেমন হইতে পারে? নিষ্ঠুর সেই

ব্যক্তি যে স্বরটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানটী আনিয়া দিল। হৃদয় স্বভাবতঃ স্বর বিশিষ্ট জীবন্ত ভাষা শ্রবণ করিতে চায়। সংস্কৃত ভাষাকে যদি মৃত ভাষার দলে নিক্ষেপ করিতে না হয় তবে সেই দেববাণী, ঈশ্বরের সেই সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিতে হইবে। "আমি আছি" যাঁহার এই সহজ সংস্কৃত ভাষা তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার ভাষা মৃত হইতে পারে না। তাঁহার ভাষার সঙ্গে মনুষ্যের ভাষার তুলনা হইতে পারে না। বরং সমুদ্রকে আকাশে রাখিতে পার তথাপি পৃথিবীর সহস্র সহস্র ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের স্বরের তুল্য হইতে পারে না। ঈশ্বরের সেই তান লয় বিশিষ্ট "আমি আছি" এই দেববাণী আর তোমাদের রাগ রাগিণী পূর্ণ ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। তোমাদের ভাষাতে স্বর্গের সুমিষ্ট স্বর নাই। তোমাদের পণ্ডিতেরা যাহা বলে তাহার স্বর কর্কশ। তাহার ভাষা পার্থিব, তোমাদের বিজ্ঞান ন্যায় বচনে পৃথিবীর গন্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের ভাষা শুদ্ধতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টতা বহন করে। ঈশ্বরের কথাতে মিষ্টতা এবং শক্তি দুই আছে। অতএব ভক্ত বলেন:—"হে ঈশ্বর, তোমারই মুখে তোমার কথা শুনিতে অভিলাষ করি।" অনেকে বলেন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-দিগের মুখেও ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক, কেন না যাঁহারা জগতের পরিত্রাণের জন্য আপনার প্রাণ দেন, তাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের কথা না শুনিলে ভক্তির উদয় হয় না; কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

তিনি বলেন, ঈশ্বরের মুখে ঈশ্বরের কথা না শুনিলে মৃতপ্রাণে জীবনের সঞ্চার হয় না। এই জন্য তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—"হে ঈশ্বর, সময়ে সময়ে তুমি তোমার সুমিষ্ট স্বরে তোমার অনুগত শিষ্যের সঙ্গে কথা কহিও।" ঈশ্বর বলেন "আমি দয়াময়" যখন ভক্ত এই কথা শুনিয়া জগৎকে বলেন "ঈশ্বর দয়াময়" তখনই জগতের যথার্থ উপকার হয়। এই কথার সঙ্গে অমিয় মাখা থাকে। ইহা বহুমূল্য, এই অমূল্য নাম শুনিয়া জগৎ ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার করে। ঈশ্বর নিজ মুখে তাঁহার ভক্তকে বলিলেন :— "আমাকে জান না? আমি যে তোমার দয়াময় পিতা।" এই কথা শুনিয়া কি আর হৃদয় দুর্ব্বল এবং নিরুৎসাহ থাকিতে পারে? তোমার আমার ভাষা ভ্রম প্রবঞ্চনা মিশ্রিত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ঈশ্বরের ভাষা এবং মনুষ্যের ভাষায় অনেক প্রভেদ। একটি হইতে অন্যটিকে সহজেই চিনা যায়। একটি স্বর্গের সংস্কৃত ভাষা, তাহা শুনিলেই মন উন্নত উপকৃত এবং মোহিত হয়। অন্যটি নীচ ইতর বাঙ্গালা কথা। রাজসভায় যেমন ইতর ব্যক্তিকে সহজেই চিনা যায় সেইরূপ যদি কেহ প্রবঞ্চনা করিয়া ঈশ্বরের উপদেশের সঙ্গে আপনার সাধু ভাষা চালাইতে চেষ্টা করে ধীর ব্যক্তিরা অনায়াসেই তাহা ধরিতে পারেন। কোন্ কথা তাঁহার প্রাণেশ্বরের ভক্ত অনায়াসেই তাহা বাছিয়া লইতে পারেন। অনেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের কথার সঙ্গে পৃথিবীর

কুমত মিশ্রিত করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন। ঈশ্বর বলেন :—"আমি তোমাকে অন্ন দান করি" "আমি তোমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছি" "আমি তোমাকে পরিত্রাণ করিতেছি" এ সকল কথার সঙ্গে সামান্য বাঙ্গালার সংস্রব হইলেই তাহা চিনা যাইবে। তোমরা অনেক গান কর তন্মধ্যে হয় তো একটি ঈশ্বরের। আমি বলি, ঈশ্বরের নামে তোমাদের কথা প্রচার করিয়া কাজ কি? সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা কখনই চলিবে না। যখন এক দল ব্রহ্মভক্ত আসিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা স্বতন্ত্র করিবেন। যতটুকু ব্রহ্মবাণী শুনিয়াছ বন্ধুদিগকে তাহাই বল। বল কল্য রাত্রে ঈশ্বরের মুখে "আমি মধুময়" এই দুটি শব্দ শুনিয়াছি। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মমণ্ডলী ভ্রম হইতে রক্ষা পাইবেন এবং ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবেন। যতক্ষণ ঈশ্বরের স্বর্গীয় ভাষা না শুনিবে একটি পাপও যাইবে না, অতএব ঈশ্বরের নিকট যাও, তাঁহার মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে শিক্ষা কর। যখন দেখিবে পলকের মধ্যে পাপ দূর হইবে তখন বুঝিবে ঈশ্বরের ভাষা কেমন প্রবল। ঈশ্বরের ভাষার সঙ্গে কদাচ তোমাদের ভাষা মিশ্রিত করিও না। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ এবং জীবন্ত ভাষা শ্রবণ করিতে করিতে তোমরা নবজীবন সম্ভোগ কর।

নারদের নবজীবন।

বৃহস্পতিবার, ২৬এ শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

দেবর্ষি নারদের জীবন বৃত্তান্ত গভীর আলোচনার বিষয়। পদ্মা নদী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যেখানে দুই নদী একত্র হইয়াছে, সেখানে কত গভীরতা, এবং সেখানকার কি গভীর শব্দ। নারদচরিত্রে দুই নদীর যোগ হইয়াছে। তাঁহার জীবনে এক দিকে যোগনদী এবং অন্য দিক হইতে ভক্তিনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আমরা যেমন সময়ে সময়ে সংসার হইতে বিদায় লইয়া সরোবরতটে বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করি, নারদও সেইরূপ একদিন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে যোগ সাধন করিতে বসিয়াছিলেন। বসিবার অল্প-ক্ষণ পরেই তাঁহার চিত্ত সমাহিত হইল, এই সময়ে স্থির সরোবর মধ্যে যেমন চন্দ্র তারকাময় সুনীল আকাশ প্রতি-বিম্বিত হয়, সেইরূপ তাঁহার গম্ভীর এবং সুস্থির অন্তরের মধ্যে দেববাঞ্ছিত হরির প্রকাশ হইল। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ঋষি আনন্দপ্লাবনে বিলীন হইলেন—তিনি এই অবস্থায় এত দূর মগ্ন হইলেন যে আপনাকে এবং হরিকে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু কেবল যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইল তাহা নহে, পরে আবার তাঁহার বস্তু দর্শন হইল। প্রথম দর্শনে আনন্দোচ্ছ্বাস হইল, দ্বিতীয় বার সেই মনোহর রূপ দর্শন হইল যাহাতে শোক

সন্তাপ দূর হয়। কিন্তু অবশেষে যখন ঋষির মনের চাঞ্চল্য হইল তখনই হরি অদৃশ্য হইলেন। হরিকে হারাইয়া নারদ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি যে মনোহর রূপ দর্শন করিলেন তাহা হারাইলে কি আর জীবন রাখিতে ইচ্ছা হয়? নারদ ভক্ত ছিলেন, তিনি নিরাশ হইলেন না; কিন্তু আবার সেইরূপ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ঈশ্বরের অদর্শন যন্ত্রণা কেমন দুঃসহ তাহা কেবল ভক্তই জানেন, এই অবস্থায় ভক্তবৎসল ভক্তের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ভক্তের সহিত কথা বলেন। ভক্তের চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু কর্ণ ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করে। নারদের কাতরতা এবং অপ্রতিহত আন্তরিক ব্যাকুলতা ও উৎসাহ দেখিয়া ঈশ্বর গম্ভীর এবং প্রশান্ত ধ্বনিতে সংগোপনে নারদকে এই কথা বলিলেন:—"ইহজন্মে আর তুমি আমার দর্শন পাইতেছ না।" বজ্রধ্বনি ভক্তের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তথাপি নারদ বলিলেন, "আমার দেখা দাও।" ঈশ্বর স্পষ্ট বলিলেন, "হে বৎস, ইহজন্মে আর দেখা পাইতেছ না।" নারদ মনে মনে বলিলেন ভক্তবৎসলের মুখ হইতে এমন নিরাশার কথা আসিবে? ভক্তবৎসল যুক্তি দেখাইলেন "ইন্দ্রিয়াসক্ত কুযোগী আমার দেখা পায় না।" প্রথম দর্শন পাপের অবস্থায় হইয়াছিল। পার্থিব পাপজীবনে নারদ প্রথম ঈশ্বরদর্শনলাভ করিয়াছিলেন, এই যে ঈশ্বর প্রথম দেখা দিলেন ইহার হেতু নাই! ইহা সম্পূর্ণ দেবপ্রসাদ। এই

অনুগ্রহের বিনিময়ে ভক্তের নিকট কিছু চাহিতে এখন ব্রহ্মের অধিকার হইল। ঈশ্বর বলিলেন, "বৎস, তোমার পাপের অবস্থায় তোমাকে দেখা দিয়াছি, এখন তুমি অধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধন দ্বারা আমাকে দর্শন কর।" আমার কার্য্য আমি করিয়াছি, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আমি একবার দর্শন দিয়াছি, এখন তোমার যত্নের সময়। বস্তু একবার না দেখিলে অনুরাগ হয় না। হে ভক্ত, পাপ সত্ত্বে আর কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে? আবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে পাপ ছাড়িয়া আসিতে হইবে। "ইহজন্মে আর দেখা পাইবে না।" ইহার গূঢ় অর্থ এই যে পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া, আসক্তি ত্যাগ করিয়া দ্বিজ অথবা বৈরাগী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। নারদ নবজীবন অথবা ভাগবৎ তনু লাভ করিলেন, ইহার অর্থ এই যে তিনি আত্মার জীবন লাভ করিলেন। নারদ হরিকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অনেক দেশ পর্য্যটন করিলেন। যাঁহারা হরিনামপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়, তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া পর্ব্বত, বন, উপবন, নদী ইত্যাদি দর্শন করিয়া মনের আনন্দে হরিগুণ গান করেন। দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিলে অনেক প্রকার আমোদ পাওয়া যায় এবং পরকেও আমোদিত করা যায়। এই জন্য নারদের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা হইল:—"অনাসক্ত হইয়া আমার নাম গুণ গাইতে গাইতে দেশ বিদেশে ভ্রমণ কর। গৃহের মায়া ছাড়,

বিদেশকে স্বদেশ কর। কোন লোকের প্রতি মায়াবদ্ধ হইও না। পর্য্যটক, পরিব্রাজক, আসক্তি শূন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন ধারণ কর। এইরূপে আমার দর্শন লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। সেই শুভ সময় আসিবে, যখন তুমি ডাকিলেই আমি তোমাকে দেখা দিব।" বহু দিনান্তর সেই সময় আসিল যখন নারদ আসক্তি জয় করিয়া নবজীবন লাভ করিলেন এবং চিরকালের জন্য ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিলেন। আমাদিগকেও ঈশ্বর দর্শন দিবেন। আমরাও পাপের অবস্থায় ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়াছি; কিন্তু শুদ্ধচিত্তে বৈরাগী হইলে তাঁহার যে দর্শন লাভ করা যায় এখনও আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। অতএব অনুরোধ করিতেছি হে যোগার্থী বর্ত্তমান নারদগণ, তোমরা আসক্তি ছাড়িয়া পর্য্যটক হও, তোমাদিগকেও ঈশ্বর নবজীবন দিয়া এবং দেখা দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

পৃথিবীর ভিতর দিয়া স্বর্গ দর্শন।

রবিবার, ৭ই চৈত্র, ১৭৯৮ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

সংসারচক্রে মনুষ্য মরে, ধর্ম্মচক্রে মনুষ্য বাঁচে। দুই চক্রই সমান। সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মনুষ্যের প্রাণ যায়, ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু করিয়া ধর্ম্মের চক্রে ঘুরিলে মনুষ্যের নবজীবন লাভ হয়। প্রায় সকল দেশের এবং সকল কালের

সাধকেরাই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাভ্যাস করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সকলের সঙ্গে, সমস্ত দলের সহিত, সমুদয় সহযাত্রিদিগকে লইয়া কিরূপে ঈশ্বরের চারিদিকে ঘুরিতে হয়, পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্ত অতি দুর্ল্লভ। স্বতন্ত্রভাবে একাকী ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ করা সহজ; কিন্তু সকলকে লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, প্রায় সকলেরই এই মত। এই জন্য প্রাচীনকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত সকলেই পৃথিবীকে ছাড়িয়া কেবল উর্দ্ধে দৃষ্টি করে! তাহারা মনে করে ঈশ্বর অতি উচ্চ আকাশে তাঁহার স্বর্গস্থ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, অতএব ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইলে, তাহারা পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করে। তাহারা পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। তাহারা কল্পনাপ্রিয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মেরাও ঈশ্বরকে উর্দ্ধদিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখান। এই ভ্রান্তমত গূঢ়রূপে আমাদের অনিষ্ট করিতেছে। উর্দ্ধে সংসার নাই, সেখানে আমাদের টাকা কড়ির ব্যাপার নাই, সেখানে বিবাদ বিসম্বাদ দুঃখ যন্ত্রণা নাই, অতএব সহজেই দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে যায়। নিম্নে সংসার, সেখানে মন বড় কষ্ট পাইয়াছে এই জন্য যে দিকে টাকার গন্ধও নাই, অর্থাৎ আকাশ, উপাসনার সময় শান্তির জন্য অস্থির মন পা দিয়া পৃথিবীকে দলন করিয়া সেই দিকেই চলিয়া যায়। আপাততঃ এটি স্বাভাবিক মনে হইতে পারে, সুখ এবং আরাম লাভ করিবার পক্ষে ইহা অনুকূল মনে

হইতে পারে। যতক্ষণ শোক দুঃখ পূর্ণ সংসারকে ভুলিয়া এইরূপে আকাশে থাকা যায় ততক্ষণ প্রাণটা স্থির হইল মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে আকাশবিহারী হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং কিছুদিন পরে দেখিব ধর্ম্মপক্ষী আর সংসারে ফিরিয়া আসিল না। আমি বলিলাম হে ধর্ম্মপক্ষী, তুমি সংসারে ফিরিয়া এস, তুমি না আসিলে আমার সংসারের বিশৃঙ্খলা হয়, আমার সংসারের কাজ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মপক্ষী আর আমার কথা শুনিল না। যেখানে ধর্ম্ম নাই সেই পৃথিবীর পানে আর তাকান যায় না। যতক্ষণ সংসারের কার্য্য করিয়াছি ততক্ষণ যেন স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় আসিয়াছি। ধর্ম্মের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ হইল না। পৃথিবীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলেই ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতেছে। এমন কি ভক্ত আর পাঁচ জন ভক্তকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, যোগী আর পাঁচ জন সহযোগী ছাড়িয়া দৌড়িতেছেন। সকলেই ঊর্দ্ধদিকে আকাশে উড়িতেছেন; কিন্তু আকাশে উড়িলে যেমন পৃথিবীর দস্যুদিগকে দেখা যায় না, তেমনি পৃথিবীর ভাল ভাল মন্দিরগুলিও দেখা যায় না। দুর্জ্জনদিগকে পরিত্যাগ করিলে সুজনদিগকেও হারাইতে হয়। আমরা পৃথিবীর জীব, আমরা হাজার কেন চেষ্টা করি না, এই পৃথিবীর ভিতর দিয়াই আমাদিগকে স্বর্গ দর্শন করিতে হইবে। নয়ন ঊর্দ্ধদিকে যাইবে সত্য কিন্তু সে যাইবার

সময় তাহা পৃথিবীর মধ্য দিয়া যাইবে। পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহার যে ভাগ উপরে ছিল তাহা নীচে আসিতেছে, যে অংশ নীচে ছিল তাহা উর্দ্ধে যাইতেছে, অতএব নীচ হইতে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিতে হইলে, পৃথিবীর ভিতর দিয়াই নয়ন চলিয়া যাইবে। প্রকাণ্ড পৃথিবী অতিক্রম করিয়া নয়ন কিরূপে উর্দ্ধে যাইবে? নয়ন পৃথিবী অর্থাৎ মনুষ্য ছাড়া নহে। সকলের সঙ্গে নয়নের যোগ রহিয়াছে। যতবার নয়ন উর্দ্ধে তাকাইবে ততবারই এ সকলের ভিতর তাকাইতে হইবে। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য আমরা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি না করিয়া উর্দ্ধে তাকাই। ইহা যোগের ভাব; কিন্তু ভক্ত তাকান নিম্নদিকে। কেন না ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম নিম্নে। যদি ভক্ত হইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে যাঁহাদিগকে ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তাঁহাদের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতেই হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব? শ্রেষ্ঠতম সাধু হইতে ক্রমে ক্রমে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই সেই চরণতলে অবস্থিত, ইহাঁদিগকে অবহেলা করিয়া কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে? ঈশ্বরকে ভুলিয়া যেমন প্রকৃতরূপে মনুষ্যের সেবা করা যায় না, সেইরূপ আবার মনুষ্যকে ছাড়িয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দলস্থ লোকগুলিকে লইয়া যাইতে হইবেই হইবে। ঈশ্বর স্বয়ং চতুরভাবে আপনাকে মনুষ্যদিগের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমা-

দিগকেও পরস্পরের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে আমরা আমাদিগের মধ্যে তিনি এবং পরস্পরের মধ্যে আমরা, অতএব স্বতন্ত্র সাধনের প্রয়োজন নাই। মনুষ্য-দিগকে লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে পিতাকে দর্শন করিব। এক পথে ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়কেই পাইব। এক তীরে যদি দুই পদার্থ বিদ্ধ করা না যায় তবে ধর্ম্ম মিথ্যা। উপাসনা মনোহর হই-য়াছে মনে করা মিথ্যা যদি মনুষ্যকে ভাল না লাগে। শ্রেষ্ঠতম ভক্ত যিনি তিনি প্রধানতম সাধু হইতে জঘন্যতম পাপী পর্য্যন্ত সমুদয় মনুষ্যদিগের নামমালা আপনার গলায় পরেন। তিনি সাধু অসাধু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে লইয়া স্বর্গে যান। তদপেক্ষা নিকৃষ্ট সাধক সমুদয় ভক্তদিগের নামমালা গলায় পরে, যাঁহারা নীচতম শ্রেণীর সাধক তাঁহারা কেবল দুই এক জন শ্রেষ্ঠ ভক্তের নামমালা কণ্ঠে ধারণ করেন। যত ভক্তি বৃদ্ধি হয় তত নামমালা বড় হয়। এই মলিন মনুষ্যদিগকে লইয়াই স্বর্গে যাইতে হইবে। বারম্বার এই মলিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে শেষে এই পথই পরিষ্কার হইবে। মনুষ্যকে পদতলে ফেলিয়া আকাশবিহারী হইলে স্বর্গে যাওয়া যায় না। অতএব মনুষ্যকে ছাড়িয়া যে পথ তাহা ধর্ম্মপথ নহে, তাহা মরিবার পথ।

বিন্দুমধ্যে অনন্ত ঈশ্বর।

রবিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

যদিও ব্রহ্মকে আমরা জড়ের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি না, তথাপি সূক্ষ্মদর্শী সাধু যোগীরা বলিয়া গিয়াছেন ঈশ্বরের বিস্তৃতি আছে। যোগী বলেন যোগ সাধন করিবার জন্য বিস্তৃত সুগভীর ব্রহ্ম চাই, নতুবা সন্তরণ করি কোথায়? ব্রহ্মের বিস্তৃতি না দেখিলে কি সাধুরা বলিতেন, "আকাশ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে এবং নভোমণ্ডল তাঁহার হস্তের রচনা প্রদর্শন করে?"—"তুমি কি অনুসন্ধান করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পার? ......আকাশের ন্যায় উচ্চ, তুমি কি করিতে পার? পাতাল অপেক্ষাও গভীরতর, তুমি কি জানিতে পার? পৃথিবী হইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ ও সমুদ্র হইতে পরিসর বৃহৎ।" মানসপক্ষী আকাশ হইতে উচ্চতর আকাশে উড়িয়া যখন ঈশ্বরের অন্ত পাইল না তখন বলিল, "ঈশ্বর এত বড়, তাঁহাকে ধরিতে গিয়া আমার মন অবসন্ন হইল।" অনেকে এই অনন্তকে স্মরণ করেন না; কিন্তু অনন্তকে স্মরণ না করিলে মন স্তম্ভিত হইবে কেন? মন উন্নতি হইবে কেন? মন গম্ভীর হইবে কেন? আমাদিগের ক্ষুদ্র মন সহজেই নিম্নদিকে যাইতে চাহে, অতএব মনকে উন্নত করিবার জন্য অনন্তের চিন্তা করা আবশ্যক। আকাশে

কি কেহ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল যে সেখানে শ্রান্ত পক্ষী গিয়া বসিবে? আকাশের যে কোন তীর নাই, আকাশ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোন দিক গ্রাহ্য করে না। সেই আকাশের ব্রহ্মকে আমরা ভাবিব, তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে আমাদিগের মন বিস্ফারিত হইবে। মনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, চিরকাল ক্রমাগত ব্রহ্মাকাশের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। অনন্ত আকাশ ধূ ধূ করিতেছে, যদি পৌত্তলিকতা দূর করিতে চাও ইহার মধ্যে যে বিস্তৃত ব্রহ্ম বাস করিতেছেন তাঁহাকে ভাবিতে হইবে। অনন্ত আকাশ দেখিলে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয় না, সেখানে শ্রান্ত পথিক স্থান পাইল না, বসিতে পারিল না, পুতুল নির্ম্মাণ করিবে কোথায়? কিন্তু কেবল অনন্ত ভাবিলে চক্ষের জল আসে না, প্রেমের উদয় হয় না, প্রেম আপনার দেবতাকে নিকটে দেখিতে চায়, এই ভাব হইতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়। এই স্থান হইতে পৌত্তলিক মূর্ত্তির দিকে যান এবং ব্রাহ্ম অমূর্ত্তির দিকে যান; কিন্তু এই স্থান অশুদ্ধ নহে, ইহা গভীরতা সাধনের অনুকূল। প্রাচীর ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে তাঁহাকে দর্শন করি। প্রেম স্বভাবতঃ আপনার আরাধ্য অনন্ত পুরুষকে নিকটে আনিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে।

জ্ঞান এই যে অঙ্গুলির উপর কালির দাগ দিলাম, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আকাশবিহারী ব্রহ্ম এই বিন্দুমধ্যে বসিয়া আছেন। যেমন আমার অঙ্গুলির উপরে তাঁহার

অধিষ্ঠান, তেমনি আবার আমার মনের ক্ষুদ্র বিভাগে তিনি বসিয়া আছেন। কে বসিয়া আছেন? যিনি অনন্ত আকাশে ছিলেন। আমার ক্ষুদ্র মনের মধ্যে অনন্ত ঈশ্বর; ইহা ভাবিলে আর কেহ চক্ষে জল রাখিতে পারে না। এইরূপে যিনি অনিমেষ নয়নে দুই কিম্বা পাঁচ মিনিট সেই অনন্ত প্রেমকে একটি বিন্দুমধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পারেন তাঁহার নিকট পাহাড় পর্ব্বত পরাস্ত হইয়া যায়। এই জন্য বলি দুইই সাধন কর, অনন্তকে দেখিলে মন বিস্ফারিত হইবে, চিত্ত বিস্তৃত হইবে এবং বিন্দুমধ্যে অনন্তকে দেখিলে হৃদয় তৃপ্ত হইবে, হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে অনন্ত পুণ্যের বাড়ী, অঙ্গুলির উপরিভাগে বিশ্বপতির অধিষ্ঠান, কণ্টকের অগ্রভাগে অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম, এ সকল কল্পনার কথা নহে, এ সমস্ত যথার্থ কথা। অনন্ত ব্রহ্ম ঘনীভূত হইয়া এই ক্ষুদ্র বিন্দুমধ্যে আছেন এই কথা বলিলে পৌত্তলিকতা হইল না। অসীম শক্তি, অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম, অসীম পুণ্য আমার মনের এই ক্ষুদ্র বিভাগে. এই ক্ষুদ্র শক্তির মূলে ঈশ্বরের প্রেমমুখ, এই স্থানে সেই স্বর্গের স্বর্ণকলস যাহা হইতে আনন্দসুধা বিনিঃসৃত হইতেছে। এই আনন্দ ইহকালেও ফুরাইবে না, পরকালেও ফুরাইবে না। অতএব আপনার হস্তের দিকে তাকাইয়া দেখ "ব্রহ্ম হস্তগত" হইয়াছেন কি না। কিন্তু সাবধান ঈশ্বরকে পরিমিত স্থানে নিরীক্ষণ করিতে গিয়া পৌত্তলিক হইও না, আমি জড়

পিণ্ডের পূজা করিতে বলিতেছি না। আমি বলিতেছি অনন্ত পুণ্যকে বিন্দুর মধ্যে দেখিতে। যদি সমুদ্রের জল একটি বাটির মধ্যে রাখিতে না পার তবে আর সাধন কি? প্রকাণ্ড ব্রহ্মকে একটি বিন্দুমধ্যে দেখিবে তবে জানিব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ। ভক্তচূড়ামণি একটি বিন্দুর পানে তাকাইয়া হাসিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণের প্রাণ ঐ বিন্দুমধ্যে বাস করিতেছেন। ঐ যে জগতের পিতা, ঐ ছোট ঘরে বসিয়া আছেন, এই তো পাগলের কথা। যদি বিন্দুর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-পতিকে না দেখিয়া থাক তবে উন্মাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমরা পাও নাই। সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম স্থানে আমার পিতা, জগতের পিতা বাস করিতেছেন, তিনি আমার মুখের মধ্যে, তিনি আমার অঙ্গুলির অগ্রভাগে, তিনি আমার মনের ক্ষুদ্র বিভাগে, এই আমার চক্ষের বিন্দুমধ্যে স্বর্গধাম, আমার পিতার বাসস্থান ছোট শিশু পাগল ব্রাহ্ম এ সকল কথা বলেন। যে দিন আমাদের দৃষ্টি ঐ বিন্দুমধ্যে সম্বদ্ধ হইবে সেই দিন আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে মরিব, স্বর্গ সম্পর্কে বাঁচিব।

জগৎ ব্রাহ্মের পর নহে।

রবিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

একজন অপরকে দয়া করিতে পারে কি না? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অনুরাগী হইয়া তাহার সেবা করিতে

পারে কি না? অথবা পরের উপকার করা কি সম্ভব? প্রশ্ন অতি সামান্য, কিন্তু বিষয় অত্যন্ত গভীর। মনুষ্যের অভি-ধানে পরোপকারের নাম দয়া। 'পরোপকার' এই কথাটি চিহ্ন করিয়া রাখ। পরের উপকার করাই দয়া, ইহা ভক্তি-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা। বাস্তবিক দয়া অন্যের প্রতি হইতে পারে না। দয়া কেবল নিজের প্রতি হয়। এক জীব অপর জীবকে দয়া করিতে পারে না, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য নিগূঢ় ভাবে আলোচনা না করিলে ইহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ থাকিবে। মনুষ্যসমাজে পরোপকারতত্ত্ব এবং পরোপ-কারের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল; কিন্তু নিস্তব্ধভাবে ভক্তিশাস্ত্র ইহার প্রতিবাদ লিখিল। যাহাকে পর বল তাহার প্রতি দয়া হয় না। পক্ষীকে জিজ্ঞাসা কর, পশুকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা ইহার প্রমাণ দিবে। তাহারা আপনার ছানা ভিন্ন অপরের সেবা করে না। মনুষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে, আমাদের স্নেহ আপনার পিতা, মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের মধ্যে আবদ্ধ, অপরকে আমরা ভালবাসিতে পারি না। আমা-দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণয় কোথায়? আমি যে ঘরে বাস করে। আমি ঘরের মধ্যে দয়া বিচরণ করে। তার পর যে আপনার হয় তাহার প্রতি দয়া হয়। যিনি যে পরি-মাণে আপনার হন তাঁহার সম্পর্কে সেই পরিমাণে প্রণয় কার্য্য করে। কি জন্তুতে, কি মনুষ্যে সর্ব্বত্র আপনার প্রতি দয়া। ধর্ম্ম পরকে আপনার না করিয়া দিলে দয়া হয় না।

আগে পর কথাটী বিলোপ কর, তার পর দয়া আসিবে। যখন কোন ব্যক্তিকে পর মনে করিবে তখন সেই ভাব তোমার অন্তর হইতে তাহার সম্পর্কে প্রণয়, অনুরাগ অথবা ভক্তিকে তাড়াইয়া দিবে এবং যাহাকে আপনার মনে করিবে তাহার প্রতি সহজেই দয়া, প্রেম এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। এই জন্য বিবাহ-শাস্ত্র স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলে। কেন না যাঁহাকে বিবাহ করা গেল তাঁহাকে যদি পর মনে করা যায় তাঁহার প্রতি প্রণয় হইতে পারে না। এই জন্য উদ্বাহশাস্ত্রের মতানু-সারে স্ত্রীকে আপনার অর্দ্ধাঙ্গ অভিন্ন হৃদয়, অভিন্ন আত্মা অথবা অভিন্ন জীব বলিয়া মনে করিতে হয়। ইহার মধ্যে গূঢ় ভাব আছে। পরকে আপনার না করিলে যথার্থ ধর্ম্ম এবং প্রীতির সাধন হয় না। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে আপনার মনে না করিলে পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হয় না। আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় না হইলে পবিত্রতা এবং সতীত্ব রক্ষা কঠিন।

সেইরূপ কোন ব্রাহ্ম যদি ব্রাহ্মসমাজকে পর মনে করেন, তবে তাঁহার নিজের ধর্ম্মজীবন রক্ষা করাই দুষ্কর। এই জন্য সাধু ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজরূপ জগৎকে বিবাহ করেন। বিবাহার্থী যেমন প্রথম রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, এই স্ত্রীকে আমার অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া গ্রহণ করিলাম। সাধু ব্রাহ্ম বুঝিতে পারেন, আমি এবং ব্রাহ্মজগৎ এই দুই অঙ্গ একত্র হইলে পূর্ণ আমি হই। অর্দ্ধেক অঙ্গ আমি, আর এক অঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ।

প্রত্যেক ব্রাহ্মের মধ্যে এই দুই থাকিবে। এই দুই যদি না থাকে তোমাদের দয়া স্বার্থপরতার আর একটি নাম। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভয়ানক স্বার্থপর যদি সে ব্রাহ্মসমাজকে বিবাহ না করে। আমার শরীরের এক অংশে যদি কণ্টক বিদ্ধ করি সমস্ত শরীর তাহা বুঝিবে; কিন্তু আমার নিকটস্থ ভ্রাতার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ কর, সেই কণ্টকবিদ্ধ অঙ্গ হইতে রক্ত পড়িতেছে; কিন্তু আমার শরীরে পূর্ণ আরাম। যদি ইহা সত্য হয় তবে আমি বলিলাম আমার দয়াকে ধিক্। আমার ভ্রাতা যদি আমার অর্দ্ধাঙ্গ হইতেন তবে তাঁহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে কি আমার শরীর সুস্থির থাকিতে পারিত? এই জন্য বলিতেছি, পরোপকার শাস্ত্রকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর। অমুকের গায়ে কাঁটা বিঁধিল আমার এক বিন্দু রক্তও বাহির হইল না, তবে আমার দয়া নাই এই কথা সপ্রমাণ হইল। একের কাঁটা যদি অপরকে বিদ্ধ করে তবে জানিব দয়া আছে। ইহা ভিন্ন পরোপকার করিতে পারি, হয় তো নাম কিনিবার জন্য কিম্বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ক্ষুধিতকে অন্ন, রোগীকে ঔষধ, মূর্খকে জ্ঞান, অধার্ম্মিককে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া আপনাকে দয়ালু বলিয়া দম্ভ করিতে পারি; কিন্তু তাহা দয়া নহে, তাহা অহঙ্কার এবং স্বার্থপরতা। যতদিন আপনার বলিয়া বিশ্বাস না হইবে ততদিন একের ব্যথা অপরকে বুঝিতে পারিবে না; একের গ্রীষ্ম অন্যে অনুভব করিতে পারিবে না। আপনার না হইলে সহানুভূতি হয় না। তর্ক সম্ভূত দয়া

স্বর্গীয় দয়া নহে। অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের চারিদিকে যতগুলি লোক দেখিতেছি ইহাঁরা যে সমাজের অঙ্গ, তোমরা সেই সমাজের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছ কি না? এই সমাজের অনেক প্রকার পাপ ব্যভিচার দেখিয়া তোমাদের অস্থি চূর্ণ হইতেছে কি না? দুইটি ভাই ভগ্নী বিপাকে পড়িয়াছেন দেখিলে কি তোমরা আপনাদিগকে বিপন্ন মনে কর? যাহারা ব্রাহ্মসমাজের বিপদে বিপদগ্রস্ত হয় না, যাহাদের গায়ে ব্রাহ্মসমাজের কষ্ট লাগে না, যাহারা কেবল আপনার স্ত্রী পুত্রের ভার বহন করে এবং আর সকলকেই পর মনে করে, সে সকল লোক বড় সুখী। তাহারা প্রচারক, আচার্য্য এবং পরোপকারী, সজ্জনের ন্যায় কর্ত্তব্যানুরোধে সময়ে সময়ে পরোপকার করে সত্য; কিন্তু পরোপকার ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ। পরোপকার করিতেছ যতক্ষণ মনে থাকিবে ততক্ষণ স্বর্গ দূরে। ব্রাহ্মসমাজকে তাহারা স্বার্থপরতা পাপ দ্বারা পর মনে করে। বিবাহ করিয়া আপনার মনে না করিলে অনুরাগ হয় না, যথার্থ প্রেম হয় না। স্বামী স্ত্রী যাহারা পর ছিল, বিবাহ দ্বারা প্রেম দ্বারা তাহারা আপনার হইল। তাহাদের মধ্যে প্রণয়ের প্রয়োজন, কেন না সন্তানাদি পালন করিতে হইবে। তোমরা এত বড় ব্রাহ্মসমাজকে প্রণয় ভিন্ন কিরূপে পালন করিবে? দয়ার ন্যায়শাস্ত্র সকলের মনে আছে। যদি স্বর্গের অধিকারী হইতে চাও সমুদয় ব্রাহ্ম-সমাজকে বুকের ভিতরে লইয়া যাও। যখন ব্রাহ্মসমাজ পাপে

মলিন হইল, তখন মনে করিব তোমাদের অর্দ্ধাঙ্গ মলিন হইল। যখন দেখিব শত্রু, ব্রাহ্মসমাজের গলায় ছুরি দিল তখন জানিব সে ছুরি তোমাদের গলায় দিল। প্রত্যেক ব্রাহ্ম হয় জগতের শত্রু নতুবা বিবাহ করিয়া জগতের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যের ন্যায় লোক পৃথিবীর জন্য সন্ন্যাসী হইয়া প্রাণ দিয়াছেন। পৃথিবীর জন্য কাঙ্গাল হইয়া, পৃথিবী ভাল হউক এই জন্য তাঁহারা এত কষ্ট বহন করিতেন।

পর ভবনে ও নিজ ভবনে বাস।

রবিবার, ২৫এ ভাদ্র, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

পৃথিবীতে কেহ গৃহবাসী, কেহ গৃহবিহীন। মস্তক আচ্ছাদন করিবার জন্য শরীর রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরপ্রসাদে কেহ কেহ গৃহ লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ গৃহবিহীন হইয়া অরণ্যে অরণ্যে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। গৃহে বাস করিলে এক স্থানে পরিবার লইয়া সুখে বাস করা যায়, গৃহবিহীন হইলে কেবলই ভ্রমণ করিতে হয়, কোন কার্য্য অবধারিতরূপে করিতে পারা যায় না। গৃহে বাস করিলে গৃহবাসের সুখ হয় কিন্তু এ সুখেরও তারতম্য আছে। কত গৃহ গৃহ বটে কিন্তু গৃহ হইয়াও বাসা। কেহ কেহ নিজ ভবনে বাস করে, কেহ কেহ পর ভবনে বাস করে। কেহ

পিত্রালয়ে সপরিবারে বাস করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগ করে, কেহ পরের ঘরে বাস করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে গৃহসুখ অনুভব করে, কিন্তু বাস্নায় কষ্ট থাকে। আপন ঘরে স্বাধীন অবস্থায় বাস করিয়া একজন সুখ পায়, আর একজন পরাধীন অবস্থায় পরভবনে বাস করিয়া দুঃখ সহ্য করে। যদিও পরগৃহে সুখ সম্ভোগ হয়, কিন্তু পরাধীনতার জন্য সময়ে সময়ে যন্ত্রণা অধিক; সে ঘর ছাড়িয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা জন্মে। ঘর আপনার না হইলে, পিতার ভবনে পরিবারের আশ্রম না হইলে, শান্তি নিকেতন না হইলে যথার্থ সুখ হয় না। আজ এ বাড়ীতে কাল ও বাড়ীতে, আজ এ পাড়ায় কাল ও পাড়ায় বাস, এ প্রকার জীবনে বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ সম্ভব নহে, স্থায়ী সুখ কেবল নিজ ভবনে বাস করিলে হয়। পরাধীন, আজ কোন স্থানে কোন দেশে কোন অঞ্চলে যাইব কিছুই স্থিরতা নাই, অস্থির চক্রে সুখ অল্প দুঃখ অধিক।

ধর্ম্মরাজ্যেও বাসা আছে, বাটী আছে। সপরিবারে পিতার ভবনে বাস অথবা ধর্ম্মসাধনের জন্য বাসাবাটীতে বাস, এ দুই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা দিল, ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিল, জীবন স্থির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল, অমনি সে স্থান ও গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল। যেখানে নদী আছে, সুরম্য উদ্যান আছে, বন্ধু আছে, সেখানে গেল। কয়েক দিন বেশ ভাল লাগিল, নূতন বাসায় ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিল, দুই মাস মধ্যে আবার সকলি পুরাতন

হইল। অন্য পল্লীতে বাস করিল, আবার সে স্থানও পরিত্যাগ করিল। গৃহ, পরিবার, সঙ্গী, জীবনের কার্য্য, কোন কিছু সাধনেরই স্থিরতা নাই দৃঢ়তা নাই, সকল বিষয়েই চিত্তচাঞ্চল্য। কখন নদীকূল, কখন বৃক্ষতল, কখন বহু সঙ্গী আশ্রয় করিল, কখন বা একাকী নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিল। সব ছাড়িয়া পাঁচ দিন কেবল পুস্তকই পড়িতে লাগিল ; দুমাস একেবারে পুস্তক না দেখা সার করিল। এ সকল বাসা বাটীর ধর্ম্ম! যতক্ষণ রুচি, ধর্ম্মসাধন ততক্ষণ। আজ এক প্রণালী গ্রহণ করিল, কালে উহা পরিত্যক্ত হইল। চঞ্চলচিত্ত ব্রাহ্ম, বাসা হইতে বাসায়, দেশ হইতে দেশে, গ্রাম হইতে গ্রামে, পর্য্যটন করিতে লাগিল ; কিছুই ভাল লাগে না। পিতার ভবনে প্রেম গৃহেতে বাস করিলে যেরূপ স্থিরচিত্ত স্থিরসুখ হয় সেরূপ হইতেছে না। বাসাতে কখন পরিবারের ভাব মনে পড়ে না, পাঁচ জনকে বন্ধু মনে হয় না। মনে হয় এই এখন আছি অপরাহ্ণেই চলিয়া যাইব। ইহাতে দৃঢ়তা বা আসক্তি জন্মে না, স্থায়ী সুখ হয় না। এক বাসায় দশ জন বাস করে, অথচ তাহারা যেন এক এক জন এক এক বাসায় বাস করিতেছে। মন্দিরে এক শত জন একত্রে বসিয়া উপাসনা করিল, সকলের পক্ষে মন্দির বাসাবাটী। সকলে আসিয়াছে পরে আবার চলিয়া যাইবে। পিতার ভবনে ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের পূজা করিল, সংসার পালন করিল, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যাইবে না, সর্ব্বদা নিকটে থাকিবে,

বিপদ দুঃখ মৃত্যু কিছুতেই ছাড়িবে না, শেষক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে একত্র থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক যোগ। বাসাবাটী লোকারণ্য, কিন্তু কিছুকাল পরে দেখিতে পাইবে সকলে এদেশ ওদেশ চলিয়া যাইবে, কেহ আর একত্র থাকিবে না। বাসার আলাপ পশু পক্ষীর আলাপের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। সুখের বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহাতে কিছু ফল হয় না। সকলে মিলিয়া এমন উপাসনা করিল, পরক্ষণেই দেখ কেহ কাহাকেও চিনে না। সকলে মিলিয়া কার্য্য করিল, যাই কার্য্য শেষ হইল কে কোথায় পলায়ন করিল। বাসার ভাব এইরূপ, কিন্তু বাড়ীর সেরূপ নয়। বাসাগৃহবাসীর জীবন বসদ্বাটীবাসীর জীবন সমান নয়। এখন আইস আমরা গৃহে স্থির হইয়া থাকিবার যত্ন করিব। এক স্থানে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া চিরদিন অনন্ত-কাল তাহাতে থাকিব। কিরূপে সাধন করিব, কাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিব, কাহারা আপনার লোক এ সমুদয় স্থির করিয়া লইবার উপায় স্থির করিব। প্রাতে উঠিবার সময় আলোচনা করিব ঠিক গৃহে বসিয়া আছি কি বাসায় আছি। এখানে কি বাণিজ্যের অনুরোধে মিলিত হইয়াছি না ইহারা সকলে ঘরের লোক বাড়ীর লোক। যাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি, তাহাদের প্রতি মন টানে কি না? সহজেই বুঝা যায়, সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, আমরা এখানে বাসায় আছি কি চিরস্থায়ী বাটীতে বাস করিতেছি। আর যেন কেহ বাসায় বাস না কর, এ পাড়া ও পাড়া করিয়া না বেড়াও,

সকলে স্থির হইয়া গৃহে প্রবেশ কর। ভাল করিয়া গৃহ সাজাইয়া আপনার বাড়ীতে বাস কর, আর পরিবর্ত্তন হইবে না। এখন নিজ গৃহে বাস করিব, নিজের সংসারে থাকিব, নিজ আত্মীয় বন্ধুজনকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিব; সেই গৃহে স্থির হইয়া বসিয়া সকলে একত্র গৃহসাধন করিব।

ব্রাহ্মগণ একবার সকলে ভাবিয়া দেখ তোমরা সকলে কোন্ দিকে যাইতেছ। তোমরা ব্রহ্মের চরণপদ্মে স্থির হইয়া বাস করিতেছ কি না? একবার স্থির হইয়া তোমাদের প্রেম ভক্তি ব্রহ্মে অর্পণ কর, নিজ গৃহ ঠিক করিয়া জীবন স্থির কর, সেখানে নির্ব্বিঘ্নে চিন্তা ধ্যান পূজায় প্রবৃত্ত হও। আপনার ঘর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া রাখ, যাহাতে চঞ্চলতা না হয় তাহাই কর। আজ একরূপ লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম, কাল আর একরূপ লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম, আর যেন এরূপ না থাকে। আপন গৃহে শান্তি সম্ভোগ কর, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অনন্ত কালের জন্য মিলিত হও। এ গৃহে তস্কর প্রবেশ করিতে পারিবে না, শান্তি ক্ষয় হইবে না। পুণ্যের ঘরে শান্তির ঘরে স্থির হইবার চেষ্টা কর, চিত্তচাঞ্চল্য জীবনের চাঞ্চল্য যাহাতে না থাকে তাহাই কর। দেখিলেই যেন লোকে বুঝিতে পারে ইনি গৃহবাসী। ইহাঁর সব স্থির হইয়াছে, ধনের সঙ্গতি হইয়াছে। ইনি শান্তি সম্বল করিয়াছেন, আনন্দ সঞ্চয় করিয়াছেন। আর এ ঘর হইতে ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া

দিব তাহার সম্ভাবনা নাই। আর এখন ইনি পরাধীন পরের দাস নহেন, পিতার অনন্ত গৃহে বাস করিতেছেন। সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ বাসা পরিত্যাগ কর। পিতার গৃহে বাস করিয়া যাহাতে স্বর্গধাম বৈকুণ্ঠধাম ইহকাল পরকাল এ ভেদ না থাকে তাহা কর। ইহলোকেই ব্রহ্মপদতলে ব্রহ্মকল্পতরুমূলে গৃহে অধিবাস কর! বাসার ব্রাহ্মসমাজ বাসার ব্রাহ্মমন্দির বিদায় করিয়া দেও। যদি গৃহ সম্পূর্ণ না হয়, অন্ততঃ গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হউক। ভ্রাতৃগণ বন্ধুগণ পুনরায় বলি অস্থায়ী বাসার জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে স্থায়ী হইতে পার এমন গৃহ নির্ম্মাণ কর, যে গৃহে ইহকালে সুখ পরকালেও সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

বন্ধনই মুক্তি।

রবিবার, ১লা আশ্বিন, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে মনের সঙ্গে লাগে না। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" পরবশ দুঃখের কারণ আত্ম-বশ সুখের কারণ। এটী পরীক্ষিত হইয়াছে, মন আর ইহাতে সায় দিতে পারে না। কথাটী জ্ঞানগর্ভ, ইহাতে অমূল্য সত্য আছে মানিলাম, কিন্তু আমরা ইহাকে যে ভাবে দেখিতেছি, তাহাতে ইহা সত্য নহে। পরবশ দুঃখের কারণ আত্মবশ

সুখের কারণ এমত গ্রহণ করিতে হইলে অনেককে ভ্রমকূপে পড়িতে হয়। জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এ কথার মূলে সত্য আছে, ফলে ইহা অসত্য হইয়া পড়ে। পরীক্ষার সময় এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যে পরবশ সুখের কারণ আত্মবশ দুঃখের কারণ হয়। পরীক্ষার সময়ে সাধনের সময়ে সুখের কারণ কি? বন্ধে আনন্দ না মুক্তিতে আনন্দ? বন্দী সুখী না স্বাধীন সুখী? এখানে বদ্ধ ব্যক্তিরই আনন্দ, বদ্ধ ব্যক্তিই সুখী। এখানে কারাগারই সুখের স্থান, প্রশস্ত মাঠ সুখের স্থান নহে। যেখানে হাতে শৃঙ্খল পায়ে শৃঙ্খল সেই শান্তি নিকেতন। যেখানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি, কেবলি স্বেচ্ছাচার, সেই কি শান্তি নিকেতন? ইহাই কি ব্রহ্মমন্দির? অধীনতা দুঃখের কারণ ইহাই কি ঠিক কথা? ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া কি বলিতে পার, যখন স্বাধীন তখন সুখী, যখন পরাধীন তখন দুঃখী। যখন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার কোন বাধা নাই, কোন প্রতিবন্ধক নাই, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, বল আছে, বুদ্ধি আছে, উপায়ের কোন অভাব নাই, তখনই কি সুখী? ভাবিতে পার রাজার ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার যথেচ্ছ কর্ম্ম করিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়। স্বেচ্ছাচারের অভিধানে ইহাই স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত। ফলতঃ ইহা সুখের কারণ নয়। মুক্তি শব্দটী ভাল, কিন্তু ইহা যেরূপে গৃহীত হয় তাহা মন্দ। মুক্তির অর্থ সমুদয় বন্ধন চূর্ণ করিয়া ছেদন করিয়া ফেলা। সমুদয় বন্ধন মুক্তিই

যদি মুক্তি হয়, ভক্তেরা ইহার প্রতিবাদ করেন। স্বর্গে তাঁহারা বলিবেন আমরা মুক্তির প্রার্থী নই। এরূপ মুক্তির তাঁহারা শত্রু ও বিরোধী, তাঁহারা ইহার বিপরীত ভাব অভিলাষ করেন। তাঁহারা বলিবেন আমরা বন্ধন চাই মুক্তি চাই না; আমরা রজ্জু দ্বারা দৃঢ় বদ্ধ হইতে চাই।

সকল প্রকারের শাসন মুক্ত মুক্ত নয়। ভক্ত ভক্তি চান, দাস মুক্তি চান। দাস আবার মুক্ত কিরূপে? দাসে মুক্ত ভাব কখন কি সম্ভব? দাস আর বদ্ধ একি। দাসত্ব স্বীকার মুক্তি এ কি প্রকারের কথা? ভক্ত এ কথা শুনেন না। তিনি ভক্ত হইয়া অবশেষে ক্রীত দাস হন। তিনি ধর্ম্মের দাস, সত্যের দাস, প্রেমের দাস, ঈশ্বরের দাস হইতে অভিলাষ করেন। সুতরাং তিনি মুক্তি চান না বন্ধন চান। তিনি দাসত্বের কষ্ট দাসত্বের কলঙ্ক দেখিয়া ভয় পান না। তিনি চান তাঁহাকে চিরকিঙ্কর চিরক্রীত দাস করিয়া রাখা হয়। তিনি শত রজ্জুতে ঈশ্বরের চরণে বদ্ধ হইতে অভিলাষী। শত রজ্জু সহস্র লৌহশৃঙ্খল হয়, এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তিনি দাস্য চান মুক্তি চান না, তাঁহার নিকট বন্ধনই মুক্তি। ব্রাহ্মের জীবনে কি কোন শাসন চাই না? যদি চাই তবে সহস্র রজ্জুতে বন্ধন কি মুক্তি নহে? ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কি বলিয়া দেন? যে যত শাসিত সেই শুদ্ধ, যে যত বন্ধনমুক্ত সেই তত পাপে জড়িত। স্বেচ্ছাচারী দুঃখী ও পাপী, শত সহস্র রজ্জুতে যে বদ্ধ সে পবিত্র ধার্ম্মিক এবং

সুখী। এই ব্যক্তি ঈশ্বর এবং পরকালের জন্য ভীত, সর্ব
নির্ম্মল থাকিবার জন্য যত্নশীল। আমরা কি ঈশ্বরের নি
এই বলিয়া প্রার্থনা করিব, "হে ঈশ্বর! বন্ধনে বড় কষ্ট, ব
খুলিয়া দাও," না এই বলিব, "হে ঈশ্বর! এক গুণ বন্ধন
গুণ করিয়া দাও।" চারিদিকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইলে, ও
হাত পা নাড়িবার উপায় না থাকিলে, তবে জানিলাম মু
নিশ্চয় জানিও শাসনে শুদ্ধি শাসনে সুখ। সোমবার হই
শনিবার পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত ১০টার সময় কার্য্যা
যাইতে হয়। সকলেই ভাবে ইহার চেয়ে আর কঠোর নি
নাই। সকলেই এ জন্য আপনাকে অসুখী মনে করে। কি
ভাবিয়া দেখ সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত যত অ
রবিবারে তদপেক্ষা অধিক অসুখ। যে দিনে নিয়ম না
স্বাধীন স্বেচ্ছাচার, সেই দিন কষ্টের দিন। যত রোগ ব্য
সেই দিনই হইয়া থাকে। যাহা ইচ্ছা তাহা করিলাম, নি
লঙ্ঘনে কিছু সঙ্কোচ হইল না, স্বেচ্ছাচারে অসুখ ব্য
উপস্থিত হইল, পরিশেষে তাহা হইতে অধর্ম্ম সঞ্চয় হই
প্রকৃতি শরীরকে কতকগুলি রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে
যে ব্যক্তি শরীর সম্বন্ধে নিয়ম প্রতিপালন করে, শারীরি
নিয়মের বশবর্ত্তী হয় তাহার শরীর সুস্থ হয় পুণ্যের আধ
হয়। যত আমরা নিয়মের বশবর্ত্তী আমরা তত সুখী। শরী
সম্বন্ধে ইহা যেমন, আত্মা সম্বন্ধেও তেমনি।

যখন আমরা ব্রাহ্ম হই, প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পু

করিতে হইবে এই সময়ে বদ্ধ হই। সেই এক কঠোর নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া আজ আমরা উপাসনা করিয়া ব্রহ্মপূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। আজ সহস্র মুখে এই নিয়মের প্রশংসা করিতেছি। যদি আমরা আমাদের রুচির উপরে উপাসনা পূজা রাখিয়া দিতাম, আজ ব্রহ্মে নিমগ্ন হইতে পারিতাম না; যোগ ধ্যানের মধুরতা অনুভব করিতে পারিতাম না। এখন যে উপাসনায় সুখী হইতেছি, কোথা হইতে? এই নিয়ম হইতে। প্রেমের সুখ নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়াতে। যাহার যেমন ইচ্ছা যদি সে তেমনি করিল, কোন নিয়মের অধীন হইল না, পরের ভাব ইচ্ছা রুচি গ্রহণ করিল না, সকল সময়ে সকল বিষয়ে নিজের ইচ্ছা প্রবল রাখিল, তবে আর পরস্পরের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রণয় হইতে পারে না। শরীরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুখী, আত্মার নিয়ম প্রতিপালন করিলে আত্মা সুখী হইবে। এই সুখের উপরেই নিজ চরিত্র নির্ভর করে। যোগ ধ্যান প্রেম সকলেতেই নিয়ম অনুসরণ করিব। যত নিয়ম মানিব, তত সুখী হইব। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চঞ্চল, কোন নিয়ম মানে না, কোন বন্ধন স্বীকার করে না, যেমন ইচ্ছা তেমনি করে, কিছু করিতেই ভয় হয় না, যাহা করিতে ইচ্ছা করে তাহাই অনুষ্ঠান করে, সেই স্বাধীন সেই সুখী, যে এ কথা বলিল তাহার ভিতরের জীবন কি প্রকার বুঝা গেল। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী, প্রবৃত্তির অধীন সে যে পাপ করিবে ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। যে নিয়ম মানে না

সে অধার্ম্মিক। সহস্র রজ্জুতে বদ্ধ না হইলে কেহ ভাল হইতে পারে না, কেহ সুখী হইতে পারে না। ঈশ্বর যখন যাহা দিবেন তখন তাহা গ্রহণ করিবে, যখন যেরূপে চালাইবেন সেইরূপে চলিবে, ঈশ্বর যখন দেখা দিবেন তখন দেখিবে, যখন শ্রবণ করাইবেন তখন শ্রবণ করিবে, সকল বিষয়ে বদ্ধ, সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া ইচ্ছা নাই সামর্থ্য নাই বল নাই, সে ব্যক্তি কখন স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। যখনি কাহাকেও দেখিব শৃঙ্খলে বদ্ধ, তৎক্ষণাৎ বলিব তাহার ভিতরে আনন্দ ভিতরে স্বর্গ। যে যত অধীন দাস, তাহার মনে তত বিমল আনন্দ। যে সকলের মস্তকের উপরে বসিতে যায় তাহার মস্তক পাপেতে লজ্জাতে অবনত হয়। যাহার ব্যবহার পরাধীন সেই সুখী। যে সেবক হইল দাস হইল আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিল, এ পৃথিবীতে ও পরলোকে সেই সুখী হইবে। অতএব বলিতেছি সকলে নিয়মের বশীভূত হও। নিয়মের বশীভূত হইলে আর উহা নিয়ম বলিয়া বোধ থাকিবে না। অসুস্থ শরীরে সুস্থতা রক্ষার জন্য নিয়ম পালন করিতে করিতে যেমন উহা সহজ হয়, বিকৃত আত্মার সুস্থতার জন্য নিয়ম পালন করিতে করিতে উহাও তেমনি সহজ হয়। যে রসনা কলঙ্কিত হইয়াছিল অপবিত্র হইয়াছিল, যে মন যে হৃদয় কলুষিত হইয়াছিল, নিয়ম পালন করিতে করিতে সমুদয় দোষ চলিয়া যায়, সমুদয় অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। এ অবস্থায় নিয়ম পালন

স্বাভাবিক হইবে, শাসন সহজ হইয়া পড়িবে। যিনি আমাদিগকে নিয়মে বদ্ধ করেন শাসন করেন তিনি সুখদাতা মুক্তিদাতা। যিনি বান্ধেন তিনিই মুক্তি দেন। যদি মুক্ত হইতে চাও বন্ধনকে আলিঙ্গন কর, শৃঙ্খলে বদ্ধ হও। ইহাতে নিজের পরিবারের দেশের এবং সমুদয় পৃথিবীর মঙ্গল হইবে, অন্যথা সকলকেই মরিতে হইবে। যতই স্বেচ্ছাচার ততই দুর্গতি, ততই পাপ এবং অন্ধকার।

নৃত্য উচিত কি না ?

রবিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

যাহা হইতে ঈশ্বর ভক্তকে বাঁচান, আবার তাহাতেই তাহাকে ফেলেন। ভক্ত যদি এ কথা বলেন, তাহার অর্থ কি ? ভক্তকে ঈশ্বর যে বিপাক হইতে রক্ষা করিলেন, আবার সেই বিপাকে ফেলিলেন; এরূপ কোন্ বিষয়ে হইয়া থাকে। ঈশ্বরের নামের মধ্যে একটি নাম লজ্জানিবারণ। যে সকল কার্য্য হইতে লজ্জা হয়, ঈশ্বর তাঁহার সাধকগণকে সেই সকল ব্যাপার হইতে রক্ষা করেন। জনসমাজে যে সকল কার্য্য লজ্জাকর, ঈশ্বর সাধককে সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে রাখেন। পাঁচ জন লোক যে কার্য্যে লজ্জা দেয়, তাহা হইতে তাহাকে এত যত্নের সহিত রক্ষা করেন যে তাঁহার একটি বিশেষ নাম

হইয়াছে। যদি তাঁহার লজ্জা নিবারণ করা একটি বিশেষ গুণ না থাকিত তবে তাঁহার লজ্জানিবারণ নাম কখনই হইত না। ইতিহাস পাঠ করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কেমন লজ্জা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন? এ কথাই বা কেন বলি যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে? আমাদিগেরই জীবনে ইহা বার বার ঘটিয়াছে। একবার নয় দুইবার নয় কতবার আমরা লজ্জা হইতে রক্ষা পাইয়াছি। সাধক এমন অবস্থায় পড়িলেন যে তাঁহাকে তজ্জন্য চিরদিন দশ জনের নিকট লজ্জিত থাকিতে হইত। সেই সময়ে এমনি ব্যাপার এমনি ঘটনা ঘটিল যে তিনি সেই লজ্জা হইতে উদ্ধার পাইলেন। কে এইরূপ ব্যাপার দ্বারা সাধককে বাঁচাইলেন? সেই লজ্জানিবারণ ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যদি সাধককে রক্ষা না করিতেন, তবে আর তাঁহাকে কে রক্ষা করিতে পারিত! সাধক এমন লজ্জাকর কার্য্যে পড়িয়াছিলেন যে আর তিনি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেন না। কত সময়ে কত পাপ কত সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য অনায়াসে ঘটিতে পারে যাহাতে সমাজের নিকট অপমানিত নিন্দিত এবং ঘৃণিত হইতে হয়, পাঁচ জনে অভদ্র বলে, কাহার নিকট আর যাইবার সাহস থাকে না। কত সময়ে সংসারের রীতি নীতি হইতে পদস্খলন হয়, অপদস্থ হইতে হয়, জীবনে এমন পাপ ঘটে যে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারা যায় না, জঙ্গলে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।

কত লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখায় দেখ ঐ সেই ব্যক্তি, যে এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে। এরূপ লজ্জার ব্যাপারে কত ভদ্র লোক সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে চলিয়া গিয়াছে। আবার জিজ্ঞাসা করি এরূপ বিপাক হইতে কে রক্ষা করেন? ঈশ্বর। তিনি কত যত্নে কত প্রকারে সাধককে পাপ হইতে লজ্জা হইতে অপদস্থতা হইতে রক্ষা করিলেন। সাধক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনায়াসে বুঝিতে পারেন এরূপ ঘটনা তিনিই সঙ্ঘটিত করিলেন। যদি ঈশ্বর সাধককে রক্ষা না করিতেন সাধকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত, পাঁচ জনের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেন না, ধর্ম্মের কার্য্য শেষ হইয়া যাইত, উৎসাহ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হইত। লজ্জা অতি ভয়ানক! ইহাতে প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়, উৎসাহপ্রদীপ নির্ব্বাণ হয় আর ভাল হইবার ইচ্ছা থাকে না। ধন মান সম্ভ্রম গৃহ অট্টালিকা এক লজ্জায় মানুষ সকলি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাতে মানুষের ধর্ম্ম বিলোপ করে, এমন কি ইহারই জন্য মনুষ্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। ঈশ্বর এই জন্য সাধকের লজ্জা নিবারণ করিয়া লজ্জানিবারণ নাম ধারণ করিলেন, এত দিন সকল প্রকারের লজ্জা হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু যাহা হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করিলেন, আবার তিনিই তাহাকে তাহাতে ফেলিলেন। তিনিই তাহাকে নির্লজ্জ করিলেন। পৃথিবীর যত প্রকার লজ্জার ব্যাপার আছে, ঈশ্বর সাধককে অতি যত্নে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করিয়া লোকের নিকট

তাহাকে নির্লজ্জ করিয়া তুলিলেন। সাধক খোল বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, দীর্ঘকাল ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, পথের মধ্যে পাঁচ শত লোক সেখানে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন, পৃথিবীর লোক সাধককে পাগল ও নির্লজ্জ বলিতে লাগিল। যিনি সহস্র লজ্জা হইতে রক্ষা করিলেন, তিনিই লজ্জা বিনাশ করিলেন, ধর্ম্মসাধনে নির্লজ্জ করিলেন। লজ্জা অধর্ম্ম করিতে কি ধর্ম্ম করিতে? অধর্ম্ম ছাড়িতে হইবে। যদি অধর্ম্ম ছাড়িতে গিয়া নির্লজ্জ হইতে হয় ক্ষতি নাই। ভক্তিরাজ্যের গভীর অবস্থা নির্লজ্জের অবস্থা। ভক্ত হইলে ধার্ম্মিক হইলে অনুরাগী হইলে লোক নির্লজ্জ হয়, সমুদয় ভয় চলিয়া যায়, আশ্চর্য্য প্রেম প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তের চক্ষে জল পড়িতেছে, তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন ঈশ্বরের নাম লইয়া চীৎকার করিতেছেন। পাঁচ জন বলিবে এ ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়াছে, এ ব্যক্তি অসভ্য। প্রেম সম্বরণ করিতে পারে না কেন?

ভক্তির সমাপ্তি কোথায়? নৃত্য ভক্তির পরিসমাপ্তি। তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন কান্দিতেছেন, কখন ধ্যান করিতেছেন, কখন প্রেমমদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জ-ভাবে গান করিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নৃত্য সঙ্গত কি অসঙ্গত? নৃত্য কুমতি জন্য কি ঈশ্বরের ভক্তি জন্য? নৃত্য জনসমাজে রক্ষা করা উচিত কি উহাকে তাড়ান উচিত? যদি ঈশ্বরকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য হয়, তবে

নৃত্যের অত্যন্ত আবশ্যক। নৃত্য না করিলে ভক্তি হয় না। অন্তরে প্রেম থাকিলে উহা নৃত্যে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, যদি নৃত্য না হয়, অন্তরে প্রেম নাই। নৃত্য সম্বরণ করিতে হইবে এমত কি প্রকার? নৃত্য যে স্বাভাবিক। বালক আহ্লাদে নৃত্য করিয়া থাকে, বৃদ্ধ কখন নৃত্য করে না। বৃদ্ধ সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, তাহার চক্ষু দশ জনের উপরে পড়ে। যাহার চক্ষু দশ জনের উপর পড়িল সে কখন নাচিতে পারে না। নৃত্য সম্বরণ করি কেন? লোকভয়ে। শিশুর লোকভয় নাই, সে স্বভাবের অনুরোধে নৃত্য করিতে থাকে, তাহাকে নৃত্য করিতে না দিলেই সে অসুখী! ভক্তিতে অশ্রুপাত হইবে বিহ্বল করিবে এবং পরিশেষে নৃত্য আসিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে যথার্থ নৃত্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্মেও নৃত্য আছে, কিন্তু সে নৃত্য বাহিরে নয় অন্তরে। কোন কালে প্রেম কি যে জানে না, সে নৃত্য বুঝিতে পারে না। সে নৃত্য বাহিক নয় আত্মার নৃত্য। মনোহর সুন্দর পরমেশ্বরকে দেখিয়া হৃদয় নাচিল, ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া উন্মত্ত হইয়া প্রাণের ভিতরে তাঁহাকে ধারণ করিল, বাহিরের একটি লোকেও তাহার সংবাদ পাইল না, কিন্তু ভক্ত হৃদয় মধ্যে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল। যখন বড় আমোদ হয় আহ্লাদ হয় ছেলেরা নাচিতে থাকে। একটি ক্রীড়ার সামগ্রী পাইলে শিশুর আর নৃত্য থামে না। আনন্দ স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতা তাহার শরীরকে বশীভূত করিয়া ফেলে আর

আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাই প্রফুল্লিত শিশুর শরীর নাচিল। প্রফুল্লতার শেষ হইল, সুখেরও শেষ হইল। পরম পিতা ভক্ত সন্তানকে স্বর্গের পুতুল দেখাইলেন, সে পুতুল কি চমৎকার মনোহর! ভক্ত দেখিয়া প্রফুল্লিত হইল, আহ্লাদ সাগরে ডুবিল। তখন সে নাচিল, বাহিরে নয় কিন্তু স্বর্গের ঘরে ক্রমান্বয়ে নাচিতে লাগিল। তোমার প্রেম হইয়াছে কি না নৃত্য তাহার সাক্ষী। হৃদয়ে মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া ভক্তের আত্মা নাচিল, এটী স্বর্গের দৃশ্য। হৃদয় যদি পাঁচ মিনিটও নাচে তবুও ধন্য। ভক্ত চুরি করিয়া হৃদয়মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। থামাইতে পারিতেছেন না, এ কি সামান্য ব্যাপার! বাহিরের নৃত্য উপাদেয় কিন্তু আত্মার মধ্যে নৃত্য সুন্দরতর এবং মনোহর। বাহিরে নৃত্য করিলে ভক্তি তত সুসিদ্ধ হয় না, যত অন্তরে অন্তরে নৃত্য করিলে হয়। জিজ্ঞাসা করি কয়জন ব্রাহ্ম এরূপ নৃত্য করিতে শিখিয়াছেন? আমরা সভ্যতার অনুরোধে কি নৃত্যকে বিদায় করিয়া দিব? এ বিষয়ে কখন মত দিতে পারি না। আহ্লাদ আমোদ কেন ছাড়িব? ব্রহ্মের সঙ্গী হইয়া হৃদয় নাচিবে, মনের ভিতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে, মন অস্থির হইয়া পড়িবে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণযোগে যোগী হইব, যোগানন্দে নৃত্য করিব। এ আমোদ কখনই ছাড়িতে পারি না। সকল সভ্যতা দূর করিয়া দিয়া পাঁচ মিনিট নয় পাঁচ ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা নয় পাঁচ দিন, পাঁচ দিন নয় অনন্ত কাল নৃত্য করিতে থাকিব। শরীর

চিরদিনের সঙ্গী নয়। স্বর্গে গেলে যে নৃত্য করিতে পারা যায় না, সে নৃত্য কিছু নয়। যথার্থ ভক্ত অন্তরে নৃত্য করেন, এমন ভাবে নৃত্য করেন যে সে নৃত্য আর অনন্ত কাল থামে না। হে ব্রাহ্ম! তোমার প্রাণ নৃত্য করুক। চল সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করি। কেন সকলে ম্লান হইয়া আছ? কেন দুঃখী হইয়া আছ? মনকে নাচাও সুখী হইবে। শিশুকে নাচিতে না দিলে সে যেমন বিষণ্ণ হয় তেমনি মনকে নাচিতে না দিলে মন ম্লান হয়। স্বর্গে পরম পিতা ডাকিলেন, তথাপি নাচিলে না, পরে কান্দিতে হইবে! একবার নৃত্য কর সকল বিষাদ চলিয়া যাইবে। একবার প্রেম উদ্যানে গিয়া বস, দেখিবে মন পাখী নাচিবে। চির-দিন নৃত্য করিতে থাক কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা আত্মার আধ্যাত্মিক নৃত্য চিরদিন সম্ভোগ করিতে পারি।

বৈদিক ও পৌরাণিক অদ্বৈতবাদ।

রবিবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৭৯৯ শক।

[ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।]

বেদেও অদ্বৈতবাদ আছে, পুরাণেও অদ্বৈতবাদ আছে। এই অদ্বৈতবাদের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিলে মন উত্তেজিত হয়, ঈশ্বরের দয়া ও প্রেমের গূঢ় ভাব বুঝিতে পারা যায়। অন্য যাহা

বলিতেছি, ইহা কঠোর কথা নহে, বলিবার উপযুক্ত, শুনিবার উপযুক্ত। ইহার গূঢ় মর্ম্ম সকলে মন দিয়া শুন। এই মাত্র শুনিলে বেদেও অদ্বৈতবাদ আছে, পুরাণেও অদ্বৈতবাদ আছে। মনুষ্য যখন আদি শাস্ত্রের মতে চলে, তখন আত্মার আকাশে উড়িতে থাকে। আত্মার সূক্ষ্ম জ্ঞান অবলম্বন করিয়া চিদাকাশে ভ্রমণ করে। এইরূপে ভ্রমণ করিয়া কি হইল? সাধক ব্রহ্মে বিলীন হইলেন। চারিদিকে ব্রহ্ম আমি তন্মধ্যে বসিলাম, আমি ব্রহ্মময় হইয়া গেলাম, ক্রমে একেবারে ব্রহ্মে বিলীন হইলাম। এক বিন্দু জল সিন্ধুতে বিলীন হইয়া গেল। জীব ব্রহ্মে লয় পাইল, একটি মাত্র পদার্থ রহিল, এই পদার্থ ব্রহ্ম। এই পুরাতন অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানে অদ্বৈতবাদ ধ্যানে অদ্বৈতবাদ। ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল, আমি কোথায় আছি আর ভাবনা থাকিল না, এক সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সকল গ্রাস করিলেন, চিদাকাশে ক্ষুদ্র মন বিলুপ্ত হইয়া গেল। যদি বুদ্ধি ভ্রষ্ট মন, বিকৃত হয়, মন আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে, সাধক জ্ঞানতরীকে আর সামলাইতে পারে না, তখন ব্রহ্মোপাসনায় সকলি বিলোপ হইয়া যায়।

যখন বেদ ছাড়িয়া পুরাণে আসিলে, পুরাণ ঈশ্বরকে দয়ার অবতার করিল। মনুষ্যের দুঃখ পাপ কুসংস্কার বিমোচনের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন, এই পুরাণের কথা। এখানে প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদ নাই, কিন্তু দেখ মন ক্রমে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয়। পুরাণ দ্বৈতভাবে আরম্ভ। পৌরাণিকগণ

অবতীর্ণ ঈশ্বরকে পূজা করিতে লাগিল, সাক্ষাৎ তাঁহার রূপ দর্শন করিতে লাগিল। পুরাণে রূপের উপাসনা রূপের পূজা। কিন্তু দেখ ক্রমে ক্রমে এই এক অবতার কোথায় গিয়া শেষ হইল। প্রথমতঃ এক ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের অবতার বদ্ধ ছিল, সেই ব্যক্তির কার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইত। শেষে ঘোর অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি হইল, লোকে বলিল, দেখ ঈশ্বর বৃষ্টি হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। বৃষ্টিতে গ্রামের হিত হইল, বৃষ্টিতে সকলে ব্রহ্মের লীলা দেখিল। আজ প্রাতঃ-কালে মুষলধারে বৃষ্টি হইল কেন? পৌরাণিক ভক্ত বলিল, এ আমাদের ঈশ্বরের লীলা। দেখ বৃষ্টির প্রত্যেক বিন্দুতে ঈশ্বর নৃত্য করিতেছেন। বৃষ্টি পৃথিবীকে পালন করিল, সুতরাং বৃষ্টিকে ঈশ্বর বলিল। জল ব্রহ্ম, জল দ্বারা উত্তপ্ত পৃথিবীর শান্তি হয়। শান্তিবারি অভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীর দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়, এ জল সামান্য জল নয়। ইহা সাক্ষাৎ অমৃত। গঙ্গা জল ইহার নিকটে অপবিত্র। আজ যে বৃষ্টি হইল, ইহা আর কিছু নহে। স্বর্গ হইতে করুণাবারি বর্ষিত হইল। এ বর্ষণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরবর্ষণ। ইহা বৃষ্টি নয়, ভগবান্ বৃষ্টির আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করিলেন।

ক্ষুধার সময়ে ভক্ত আহারের সামগ্রী পাইলেন। এই আহারের বস্তু কোথা হইতে আসিল? কুসংস্কার, কুযুক্তি, কুবিজ্ঞান বলিল, ক্ষেত্রে ধান জন্মিল, চাসা সেই ধান বিক্রয় করিল। সেই ধান হইতে চাল বাহির করিয়া মনুষ্য আপনি

রন্ধন করিল, রন্ধন করিয়া উহা আহারের উপযুক্ত করিল। ভয়ানক শব্দে “না” বলিয়া ভক্ত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন ঈশ্বর আপনি শস্য হইলেন, আপনি রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধন করিলেন। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলিল। ভক্ত সে কথা শুনিলেন না, তিনি বলিলেম তোমরা সকলে মূর্খ, তোমরা অন্ধ হইয়া এরূপ বলিতেছ। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম ইহার সুবহু প্রমাণ আছে, তুমি যাহাকে পাচক বলিতেছ তিনি পাচক নহেন। তোমরা ইহাঁকে মানুষ বলিতেছ, আমার পক্ষে ইনি ঈশ্বর। তোমরা বলিতেছ এ সকল আহারীয় সামগ্রী সামান্য পৃথিবীর বস্তু, আমি বলিতেছি এ সকল বস্তু সেই ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্ত অকুতোভয়ে বলেন, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার ক্ষুধা নিবারণ করেন, তিনিই অন্ন আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনিই অন্নদাতা, তিনিই অন্ন। এই বস্তু যাহাতে জীবিত রহিয়াছি ইহা ব্রহ্ম, পুষ্টি ব্রহ্ম, পুষ্টির হেতু ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্তের নিকট যিনি অন্ন দেন, অন্ন পরিবেশন করেন, তিনি ব্রহ্ম। যে অন্নে শরীর পুষ্ট হয় উহা ব্রহ্ম। এই পুষ্টি এবং পোষণ সকলি ব্রহ্ম।

ভক্ত উদ্যানে গিয়া একটি ফুল দেখিয়া হাসিলেন, পুষ্পও তাঁহাকে দেখিয়া হাসিল। তিনি ঘরে আসিয়া বলিলেন, আজ ব্রহ্ম ফুলের আকার ধারণ করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিলেন। তিনি যে দ্বৈতবাদে প্রথম জীবন আরম্ভ করিলেন, তাহা চলিয়া

গেল; সমুদয় অদ্বৈতবাদে ব্যাপ্ত হইল। এখন তাঁহার নিকটে অন্ন জল বায়ু পুষ্প সকলই ব্রহ্ম হইল। ভক্ত প্রেমনয়নে দেখিলেন, ঈশ্বরই বন্ধু ঈশ্বরই মিত্র। তিনিই রন্ধন করিয়াছেন, তিনিই বস্ত্র দিতেছেন, তিনিই টাকা আনিতেছেন, তিনিই তাহার জন্য কার্য্য করিতেছেন। ভক্ত চারিদিকে তাকাইলেন, তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। অগ্নি জল আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বন্ধু স্বজন সাধু ভক্তমণ্ডলী সকলই তাঁহার নিকটে ব্রহ্ম হইল। সুতরাং তিনি বলিলেন, সকলই ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম। প্রেমশাস্ত্র অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম ভিন্ন প্রেমিকের আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। বৈদিক অদ্বৈতবাদ ঈশ্বরকে চিৎ এবং সকলই চিৎ বলিল, পৌরাণিক ভক্ত বলিলেন, আমি জগৎও দেখি না, চিৎও দেখি না, আমি দেখি কেবল আমার প্রাণের ঈশ্বর। আমি ফুল দেখি না, কেবল ব্রহ্ম। আমার নিকটে ব্রহ্ম এবং পদ্ম সতন্ত্র নহে, ব্রহ্মই পদ্ম পদ্মই ব্রহ্ম। চন্দ্র সূর্য্য পুষ্প যাহাতে রূপ গুণ আছে, সে সমুদয় ভাল বস্তুই ব্রহ্ম, স্বয়ং ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্ত এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রেমে অবতীর্ণ হইলেন, সকলই প্রেমময় হইল এবং তিনি সর্ব্বত্র সেই প্রেমময়ের লীলা দেখিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কি বলেন? তিনি বলেন, এ দুয়ের মধ্যে সত্য আছে, ইহাতে দেখিবার এবং সম্ভোগ করিবার বিষয় আছে। প্রেমে মত্ত হইয়া এমনি ভাবে

চারিদিকে তাকাইতে হইবে যে ভক্ত সর্ব্বত্র ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইবেন। তিনি স্বতন্ত্র, কিন্তু একটি কথা শিখিতে হইবে, চক্ষু অপবিত্রতা দেখিবে না। চক্ষুকে প্রেমে অনুরঞ্জিত করিলে, একজন ভক্ত রসনায় জয় দয়াময় জয় দয়াময় বলিতে-ছেন, তন্মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মুখে ব্রহ্ম ক্রীড়া করিতেছেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। বন্ধুগণ ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, শাস্ত্রী শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন শুনিয়া গা সিহরিয়া উঠিল। ভক্ত বলিলেন, কে আমায় এই সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইল? কে আমায় এই সকল জ্ঞানের কথা বলিল? অমনি ভক্তের কর্ণে এই গম্ভীর শব্দ প্রবেশ করিল, "আমি তোমার ঈশ্বর।" আমি এই গম্ভীর কথাকে অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু আমার চক্ষু বিবাদী হইল। সে বলিল, কৈ এই তো বন্ধুগণকে এই তো শাস্ত্রীদিগকে দেখি-তেছি, এখানে দেবতা নাই। কর্ণ বলিতেছে আমি প্রমাণ দিতেছি, ঈশ্বর সঙ্গীত শুনাইলেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন, তিনি ইহা আপনি বলিতেছেন। চক্ষু কর্ণের বিবাদ উপস্থিত হইল, ভক্তি আসিয়া মীমাংসা করিলেন, যাহা কিছু সত্য তাহা ঈশ্বর। বন্ধু বান্ধব আমার মাত্র। যে সুমিষ্ট কথা শুনিলে, অন্তরের প্রণালী দিয়া ঈশ্বর কথা কহিলেন। হে শাস্ত্রী! বুঝিলাম তুমি খোসা। তোমার ভিতরে থাকিয়া ঈশ্বর অমৃত বর্ষণ করেন। আমি তোমায় ছাড়িয়া তোমার ভিতর হইতে যে সত্য আইসে তাহাই গ্রহণ করিব।

প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া সুশীতল হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমায় আশ্রয় দিয়া শীতল করিল? হে বৃক্ষ! তুমিই কি আমায় সুশীতল করিলে? অমনি দৈববাণী হইল, "আমি তোমার ঈশ্বর" হায়! আমায় এই প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পথি-মধ্যে ঈশ্বর বটবৃক্ষের ভিতরে বসিয়া দুপ্রহরের সময় শান্তি দিলেন, শাস্ত্রীর মধ্য দিয়া শাস্ত্র শুনাইলেন, বন্ধুর মধ্য দিয়া সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইলেন। হে বৃক্ষ! তুমি আমার পরম উপকার করিলে। আমি তোমার ভিতর দিয়া আমার প্রাণের ঈশ্বরকে দেখিলাম। আমি তোমাদের কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিব না, পিতা মাতা ভাই বন্ধু দাস দাসী সকলেই আমার হিতসাধন করিতেছেন, পরম উপকার করিতেছেন। সকল-কেই জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কে? ভাই ভগ্নীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বল তোমরা কে? মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া লীলা করিতেছ, তোমরা সামান্য নও। সেখান হইতেও এই গম্ভীর ধ্বনি আসিল, "আমি তোমার ঈশ্বর।" যেখানে যাই দেখি সকল কাজ তিনিই করেন। বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা দাস দাসী সকলেই মিথ্যা, সত্য কেবল ঈশ্বর। কে আমার বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা দাস দাসী যাহারা কার্য্যসাধন করিয়া আমার উপকার করিয়া থাকে? যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে? তোমরা কে আমার উপকার করিলে? উত্তর আসিল, "আমি

তোমার ঈশ্বর।” আহা কি সুমধুর কথা! ঈশ্বর আপনি আমার জন্য দাসত্ব স্বীকার করিলেন। প্রেমের মত্ততা আর অধিক দূর যাইতে পারে কি না সন্দেহ। ভক্তি অদ্বৈতবাদের পথ বন্ধ করিল। সকল বস্তু সকল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশ পাইলেন। কি খাইব, কি পরিব, আর তাহার জন্য ভাবিও না। ধন উপার্জ্জনের জন্য সংসারী বিষয়ীর ন্যায় চিন্তিত হইও না। ঈশ্বর তোমার হইয়া পরিশ্রম করিবেন, সকল ভার তাঁহার হস্তে ছাড়িয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি তোর সকল ভার লইয়া তোকে সুখী করিব! বাস্তবিক সুখী করেন কে? ঈশ্বর। সুখী করিবার ভার তোমার, আমার হাতে নাই। তিনিই নানা রূপ ধারণ করিয়া ঐহিক পারত্রিক জীবনের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের বিবিধ লীলা স্মরণ কর, আনন্দে নৃত্য করিবে।